প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র : ১৩৭৮
আগস্ট : ১৯৭১

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমীর
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তরের
মুদ্রণ বিভাগ

উৎসর্গ :—

বন্ধুপত্নী বনানী ঘোষকে-

সোলেমান ভাইয়া,

মেরে বুলবুল হিন্দুস্থানে বসে তোমায় আবার স্মরণ করছি। তুমি হয়তো ভাবছো আমার স্মৃতি-দর্পনে তোমার কোন প্রতিচ্ছবি আর নেই, সবটাই মুছে গেছে। কিন্তু খোদার কসম, আমি কিছুই ভুলিনি। ভুলতে পারি না। চক্রবৎ দিনগুলি ঘুরে চলেছে, সুখ-দুঃখের আলো-আধাঁরিতে আমি ক্রমশই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছি। ব্যাঙ্গালোরের জলাহাতি গবেষণাগারে আমি এখন বন্দীপ্রাণ। ভারী জলের সঞ্চিত ভাণ্ডারে আমার কাজ। ছুটি খুব কম। সেই সকালে বিচিত্র ইউনিফর্ম পড়ে ঢুকে পড়ি এখানে, আর যখন ফিরে আসি তখন রাত ঘনিয়ে আসে। নিজেই নিজের ফিয়েটখানা ড্রাইভ করি, সরিসৃপের মতো ওটা প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। স্টিয়ারিংয়ে হাত দিতেই মনে হয়, না-আমি এখনও বেঁচে আছি। এইতো পেশল লোমশ হাত, ডান হাতে একটা মস্ত জরুল. ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি ওটা নাকি শুভ চিহ্ন। ভারী জল নিয়ে অতি আধুনিক পরমানবিক গবেষণা যদি চূড়ান্ত কৃতিত্বের মাপকাঠি হয়, তবে আমার ঐ শুভ চিহ্ন নিশ্চয় ফলপ্রসু হয়েছে বলতে হবে।

কিন্তু থেকে থেকেই কেন জানি হাঁপিয়ে উঠতে চায় মন। মাথার

উপর ধূসর পাণ্ডুলিপির মতো আকাশ। এ্যাডোড্রামের খুব কাছাকাছি এই বনেদী হোটেল খানা। অহরহ উড়ুক্কু অতিকায় খেচরের গর্জন শুনতে পাই। চারতলা হোটেলের প্রশস্ত ছাদের উপর উঠে কল্পনা-বিলাসে আমার মনে হয়, গোটা শহরটা যেন একটি ফুলকাটা কার্পেট। অসংখ্য ছুটন্ত গাড়ীগুলি যেন জোনাকির মতো দপ্ দপ্ করে জ্বলছে-নিভছে।

হোটেলটিতে বহু বিদেশীর সমাগম হয় শীতের প্রারম্ভে। হরেক দেশের হরেক খানা প্রস্তুত নিয়ে হেঁসেলের অতি ব্যস্ততা এক দেখবার বস্তু। প্রধান বাবুর্চিটি তোমাদের মধ্যপ্রাচ্যেরই লোক, দামাস্কাসে জন্ম তার, এডেনে এক আন্তর্জাতিক হোটেলে বেশ কিছুদিন কাজ করেছে, বছর খানেক হলো ইণ্ডিয়ায় আছে। ইদানীং শুনছি, সে আবার ফিরে যাবে মধ্যপ্রাচ্যে, নিজেই হোটেল খুলে বসবে পোর্টসৈয়দে। বেশ লাগে লোকটিকে। আরবীয় বলে মনেই হয় না। বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারা, তামাটে রঙ, টেবা টেবা মুখ, ঝক ঝকে দাঁত, কিন্তু পাঁশুটে ঘোলাটে চোখ। এক এক সময় তো মনে হয়, ও বুঝি অন্ধ। নিশ্চিত হবার জন্যই বলি, 'শুনলাম তুমি নাকি পোর্টসৈয়দে হোটেল খুলতে চাইছো।'

বাবুর্চি বিগলিত হাসে, 'সবই খোদাতাল্লার কৃপা। নসীবে থাকলে হবে। জোর যুদ্ধ চলেছে ওখানে। যুদ্ধের খাতিরেই হোটেল-ব্যবসা আরো মজবুত হয়।'

যুদ্ধ,—এই যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলেই তোমার কথা মনে পড়ে যায় সোলেমান। তুমিও তো মধ্য প্রাচ্যের লোক, পিড়ামিডের দেশে তোমার জন্ম। জলপথ আর মরুপথে বেড়ে ওঠা তোমার শাণিত অভিজ্ঞ যৌবন। পুরো ছ'ফিট লম্বা শরীর, টকটকে রঙ, তীক্ষ্ণ নাশা, নিখুঁত বাকা গোঁফ, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, আমাদের দেশে জন্মালে দেবকুমার মদন আখ্যা পেতে। কিন্তু তুমি বড় কথা বলতে কম,

হাসতে কম, এতটুকু কবিত্ব ছিল না তোমার ভিতর। যতটুকু করবার ততটুকু করেই তুমি আবার জনারণ্যে হারিয়ে যেতে। এখানেই তোমার সাথে আমার বিরাট তফাৎ। আমি শুধু আপন চিন্তায় বক বক করে যেতাম, তুমি নিখাঁদ গাম্ভীর্য নিয়ে তাই শুনতে। মুখ তুলে দেখতাম, দৃষ্টি তোমার হারিয়ে গেছে বহুদূর,—হয়তো সেই মরুপথে, যেখানে হাজার হাজার আরবীয় উদ্বাস্তুকে তাতিয়ে মারছে ইস্রায়েলী ক্রূঢ়তা। অথবা, তোমার দৃষ্টিপথে ধরা দিত, লোহিত সাগরের আছাড়ি পিছাড়ি, যার বুক বেয়ে তোমার জাহাজ The Sun তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে। জাহাজে আছে দুটি বন্দী,—কাফের ইহুদী বন্দী,—এক যুবক এবং এক যুবতী। মোসেফ এবং হুইনা। কিন্তু কি করবে ওদের নিয়ে তুমি? হত্যা করবে না, মুক্তি দিয়ে দেবে? মানবিকতা বড় না, সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা বড়? কিছুই স্থির করতে না পেরে যন্ত্রনায় ছটফটিয়ে উঠোছলে তুমি।······

যাক, এতো সব পরের কথা! আগে আমায় মনে করতে দাও, কখন কোথায় তোমার আমার প্রথম মোলাকাৎ হয়েছিল! হাঁ মনে আছে, মস্কোর লুলুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। কত বড় ইউনিভারসিটি আর কত দেশের ছেলে-মেয়েদের ব্যাপক সমাগম। লাইব্রেরী ঘরে দিনে অন্তত চারটি ঘণ্টা আমি কাটাতাম। ওখানেই পরিচয় হয়েছিল তোমার সাথে। তুমিনৌবিদ্যার একটি মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলে। তোমার আর্য-দীপ্ত চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি এখানকার কোন বিভাগের ছাত্র?'

তোমার গভীর দৃষ্টি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বললে, 'আমি ছাত্র নই। আমি মিশরীয় নৌবাহিনীর লোক। সোভিয়েত সরকারের কাছে এসেছি এক সামরিক কমিশনের সদস্য হয়ে।'

তাজ্জব বনে গেলাম তোমার কথা শুনে। এত অল্প বয়সে এমন

গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব লাভ করা সহজ কথা নয়। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতেই তোমার একখানা হাত চেপে ধরলাম, বললাম, 'আমি একজন ভারতীয় ছাত্র, বস্তুবিজ্ঞানের পাঠ নিতে এসেছি। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়, আমি লিখি। আমি অনেক কাগজে লিখে থাকি। আপনি সৈনিক। শোনান না আমাকে আপনার জীবনের কিছু খণ্ডিত অভিজ্ঞতা! বড় ভালো হয় তবে।'

আমার কথায় আবেগ ছিল, আন্তরিকতা ছিল। তোমাকে তা স্পর্শ করেছিল নিশ্চয়। তাই তুমি এত জহজেই আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে এলে। মস্কোতে তোমার অবস্থান ছিল মাত্র পনেরোটি দিন। কিন্তু ঐ স্বল্প সময়ই আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তুমি আমার একমাত্র মিশরীয় বন্ধু! তবু তোমার মধ্য দিয়েই যেন আমি জানতে পারছি, পিড়ামিডের দেশের আসল অন্তর্কাহিনী,—এর সাফল্য, এর ব্যর্থতা, এর সুখ, এর বেদনা,—সব জানতে পেরেছি। সব!

১৯৫৯ সাল থেকেই নৌবাহিনীর কমিশনড্ অফিসার তুমি।

প্রথম বছরই তোমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে একটি কারণের জন্য। সে ঘটনা যখন ভাবি, আমারও মন লবণাক্ত চেতনায় ভরে ওঠে। সেই মূহুর্তে আমার যুদ্ধ বিরোধী চেতনা প্রতিটি স্নায়ুর উপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করে। ঘৃণা অনুভব করি নয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রতি. যারা পৃথিবীর স্থানে স্থানে সীমাবদ্ধ যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে নিজেদের অস্ত্র ব্যবসাকে তুঙ্গে তুলে ধরবার জন্য।

১৯৫৯ তে আরব ইস্রায়েল সংঘর্ষ দানা বেধেছে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রও আক্রমণ শানাবার জন্য প্রস্তুত। ...সে সময় তুমি তোমার ছোট্ট ক্রুজার The Sun নিয়ে অতন্দ্র প্রহরায় রয়েছো লোহিত সাগরের মুখে। রাতের সমুদ্রের রঙ শ্লেটের মতো। মাঝে মাঝে ফসফরাসের চাকচিক্যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পুরা প্রাক্তন মমির

মতো নিশ্চল তুমি জাহাজের ডেক ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে। জাহাজের পাটাতনে চারটে দূর পাল্লার কামান, আর ছাদের উপর দুটো এ্যাক এ্যাক "দি সানের" বিধ্বংসী ক্ষমতা জানিয়ে দেয়। কোন এক কেবিনে কে যেন রেকর্ড চালিয়ে দিয়েছে। মিষ্টি সুর লহরি ভেসে আসছে এতদূর।

তোমার জাহাজে এক জোড়া ইহুদি দম্পতি বন্দী হয়ে আছে। সুয়েজের বুকে ওরা একটি বোট সমেত ধরা পড়ে যায় মিশরীয় জল পুলিশের কাছে। শিকারি চিতা যেমন করে হরিণ ছানার টুটি চেপে ধরে, ঠিক তেমনি ওদের পাকড়াও করে The Sun এ নিয়ে এসেছিল জল পুলিশের এক জবরদস্ত কর্তা হারুন ইয়াকুৎ। ইয়াকুতের শরীরে বোধহয় হাবসিদের রক্ত আছে, ওর রক্তলাল চোখদুটো ভয়াবহ হিংস্র।

ঃ স্যার, সুয়েজে ঢুকে পড়েছিল এরা। নির্ঘাৎ গুপ্তচর!

হারুন ইয়াকুৎ যেন হুঙ্কার ছাড়ে।

তুমি চমকে উঠলে। সেই চমক বিস্ময়ে পরিণত হলো ইহুদি দম্পতির দিকে নজর পড়তেই। আহ! যেন মখমলে গড়া দুটি প্রাণ। যৌবনের নদীতে বান ডেকেছে। রক্ত গোলাপের মতো দুটি ঠোঁট আতঙ্কে থরথরিয়ে কাপছে।

ঃ স্পাই!

ঃ হ্যাঁ স্যার, বোট নিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছিল সুয়েজের ভিতর। নিশ্চয় কোন বোমা ছিল হাতে। ধরা পড়বার ভয়ে জলে ছুড়ে দিয়েছে।

ইয়াকুৎ নিজের কৃতিত্বে মোম লাগানো গোঁফে আরো পাক লাগায়।

তুমি আকাশের দিকে তাকালে। কান পেতে বাতাসের গোঙাণি শুনলে। তারপর আবার নজর পড়লো ইহুদি দম্পতির উপর। আর একবার চমকালে।

ইয়াকুৎ একটানা বলে চলেছে, "...কিছুতেই স্বীকারোক্তি দিলো না হুজুর। চাবকে ছেলেটার পিঠের চাম তুলে দিলাম, তবু ও না। আর মেয়েটা তো এক বাছুরে প্রেমের গল্প ফেঁদে বসলে। বললে, সে নাকি এক ইস্রায়েলী জেলা শাসকের মেয়ে, নাম হুইনা; পালিয়ে এসেছে ঐ তূলো-ব্যবসায়ী ছোকরা মোসেফের সাথে। ...এমন গল্প আবার বিশ্বাস করতে হবে, তাও কি না এই যুদ্ধের দিনগুলিতে!"

হারুন ইয়াকুৎ হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামলে একখানা হলদে খাম সে এগিয়ে দিলো তোমার দিকে। বললো, হেড-কোয়ার্টারের নির্দেশ নামা আছে এতে; বন্দীদের যা কবরার, এতেই লেখা আছে।'

ইয়াকুৎ এক সময় বিদায় নিলো। জল পুলিশের লঞ্চটা ভেপু দিতে দিতে রাতের অন্ধকার চিরে আবার তার টহলদারি শুরু করলো।

বন্দীদের ঠেলে ঢোকানো হলো জাহাজের খোলের মধ্যে। তারপর নির্দেশপত্রখানা চোখের সামনে মেলে ধরলে। সেই চূড়ান্ত হুকুমনামা। কেউ যেন টের না পায়,—লোহিত সাগরের জল আর একটু লাল করে দিও দুটি তরুণের তাজা রক্তে।

অন্যায়। বুজরুকি!

তবু এমন চলে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী আর সততা, মানবিকতার ধার ধারে না। রাষ্ট্র নামধেয় যন্ত্রে যেমন খুশী পিষে মারা হবে, রাজনীতি নামক বস্তুটি যত খুশী বিষ চড়িয়ে বেড়াবে, আমি—তুমি সবাই সেই বিষে জর্জরিত হবো। এ্যাটম-হাইড্রোজেনের যুগে মহাযুদ্ধ অচল, কিন্তু সীমাবদ্ধ যুদ্ধগুলিরই বীভৎসতা কল্পনাতীত।

তুমি ভাবছিলে। তোমার মনে হয়েছিল, সম্প্রধৃত ইহুদী দম্পতি নির্দোষ। ওদের ভয়বিহ্বল নিষ্পাপ চাউনি প্রমাণ করে দেয়, যুদ্ধ-

বাজদের আয়ুধ তারা নয়। নতুন স্বপ্নে মশগুল থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিধি লঙ্ঘণ করেছে। তাই ক্ষমা নেই,—লোহিত সাগরে মিশে যাবে ওদের কলিজার রক্ত।

দিন আর রাতের তফাৎ অনেক। দিনে যে মানুষ কর্তব্যের নামে অনেক নিষ্ঠুর অবিচার অবলীলায় করে যায়, রাতে সেই মানুষই বিবেকের চাবুকে যেন হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে। তখন তো রাত আর সামনে রয়েছে জল। এ দুয়ের মুখোমুখি তুমি সত্যই কুঁকড়ে পড়েছিলে। কিছুতেই ভুলতে পারছিলে না ঐ দুই বন্দীর মুখ. সঙ্গীতাচার্য্য সিবেলিউসের একটি করুন সিম্ফোনীর মতো মনে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তোমার। কি করবে তুমি ওদের নিয়ে? হত্যা করবে না মুক্তি দিয়ে দেবে? মানবিকতা বড় না সামরিক শৃঙ্খলা বড়? কিছুই স্থির করতে না পেরে যন্ত্রনায় ছটফটিয়ে উঠেছিলে তুমি!···

অথচ, কী আশ্চর্য! ভোর হতেই মেজাজটা যেন পাল্টে গেল। রক্তরাঙা আকাশের দিকে তাকিয়েই যেন তোমার মনে পড়ে গেল, সমুদ্রের বুকে কিছুটা তাজা লালিমা ঢেলে দেওয়া উচিত। হিংস্র গণ্ডারের মতো শুরু হলো তোমাদের দাপাদাপি, চল্লিশ জন মিশরীয় জোয়ানের সে কী উল্লাস। যেন সিরিক্কো বাতাসের হলকায় ওদের বুকে আগুন লেগেছে। দুটো টাটকা ইহুদীর রক্ত ঝরা দেখতে কী বন্য আনন্দ। প্রতিহিংসার স্পৃহায় ধক্ ধক্ করে জ্বলছে প্রত্যেকের চোখ। আর তুমি এক কবন্ধের মতো এগিয়ে চলেছো নীচতলায়,—যেখানে জাহাজের খোলে আবদ্ধ রয়েছে দু'টি দলিত প্রাণ!

সশব্দে খোলের দরজা খুলে গেল।

তুমি হুমড়ি খেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লে। ···কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছিটকে বেরিয়ে এলে বাইরে। তোমার এতক্ষণের উল্লসীত দৃষ্টি সেই মূহূর্ত্তে যেন নির্বাপিত, তোমার ঠোঁট দুটো যন্ত্রণায় বেঁকে

গেছে, পেশল হাত দুটি অবশ, খাঁদ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কম্পন তুলে বললে, 'They have made us phool ! They have committed suicide !'

দুটি দেহই ঝুলছে !

খোলের ভিতর এক তক্তাপোষে দাঁড়িয়ে দু'জনেই মৃত্যু-বন্ধনীতে ঝুলে পড়েছে। দুইনার নীল সাটিন ছিঁড়ে দড়ি বানিয়েছে তারা। গলায় ফাঁস লাগিয়ে চলে গেছে চিরমুক্তির দেশে।··

নিজের কেবিনে ছুটে এলে তুমি। থর থরিয়ে কাঁপছে হাত-পা। হুইস্কির শিশিটা চেপে ধরলে মুখের উপর, নির্জলা এ্যালকহলের জ্বালায় যেন প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলে ঃ খোদা-ই হাফেজ, খোদা-ই হাফেজ।···

দেখলে তো সোলেমান, আমার মনেই আঁকা আছে তোমার অন্তর্জ্বালা !···

তোমার পর্যটক-জীবনে স্থায়ী ঠিকানা সংগ্রহ করা বেশ কঠিন: মিশরীয় কনস্যুলেট থেকে অনেক মেহানতের পর তোমার বর্তমান অবস্থানের পাত্তা লাগাতে পারলাম। জানলাম, তুমি এখন ঝড়ের কেন্দ্র ত্রিনিদাদে আছো। রণনীতি আর কূটনীতি,—দু'জগতেই তোমার সব্যসাচি ভূমিকা আমাকে বিস্মিত করছে।

ভায়া, আমি তো এক ছোট ইন্দারায় সাঁতার কাটছি। তুমি আছো মহাসমুদ্রে। তোমার প্রতিটি চিঠিতে সেই মহাসমুদ্রের সন্ধান পেতে চাই। আপাতত ঃ আমায় জানাও অগ্নিগর্ভ ত্রিনিদাদের অবস্থা। এখন অনেক রাত। আর তাই চিঠি দীর্ঘ করবো না। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবো তোমার উত্তরের।

প্রীতি সহ
তোমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধু
সেনগুপ্ত।

প্রিয় সেনগুপ্ত,

তোমার সাহিত্য-সুন্দর চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ।

জনারণ্যে হারিয়ে যাবার মানুষ তুমিও নও। আমার মন থেকে তোমায় মুছে ফেলে, এমন হিম্মৎ কারুর নেই। তোমার স্মৃতি আমার কাছে ভাস্বর, তোমার চিঠি সেই বন্ধনকে আরো দৃঢ় করলো। আবার তাই আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভাই, আমি দারুণ ব্যস্ত। আমাদের জাতীয় সরকার আমাকে নানাভাবে সম্মানিত করেছেন। জানি না, এ সম্মানের কতটুকু মর্যাদা আমি রাখতে পারবো। সত্যি, যুদ্ধক্ষেত্র এবং কূটনীতির ক্ষেত্র,—দুটো স্থানেই বল্গা ছাড়া ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছি। মহানুভব নাসেরের নামে আমি যেন সফল হই। খোদাতাল্লার কাছে আমার এটাই তো একমাত্র প্রার্থনা।

তুমি যে ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমাকে চিঠি লিখেছো, সে রকম অপরাধ আমি একাধিকবার করেছি। কিন্তু ভাই, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি নির্বিকার, স্বদেশের স্বার্থে জীবন-মন সঁপে দিয়েছি। আমি জাতীয়তাবাদী। বলতে পারো, কট্টর জাতীয়তাবাদী।

হাঁ, আমি এখন ত্রিনিদাদে। অগ্নিগর্ভ ত্রিনিদাদ। ক্যারিবিয়ান সাগর বিধৌত এই ছোট্ট দেশটিতে একের পর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ফেব্রুয়ারী মাসে [আমি তখনো ক্যারিবিয়ান সাগর পেরিয়ে এখানকায় দূতাবাসে এসে পৌঁছাইনি]। ঐ মাসে ছাত্র ও যুবকরা যে আন্দোলন শুরু করেছিল; এখন তা ত্রিনিদাদের 'নিগ্রো বিদ্রোহে' পরিণত হয়েছে। মাত্র দশলক্ষ অধিবাসীর বাস এই ছোট ছবির মতো সুন্দর দ্বীপটিতে।

দারুণ জঙ্গী দাপট চলেছে। একদিকে বিদ্রোহীদের চোরাগোপ্তা

আক্রমণ, অন্যদিকে সরকারী বাহিনীর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ,—রক্তসিক্ত ত্রিনিদাদে পাইকারি হারে মানুষ মরছে।

সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে। জনতার সাম্য-দাবীকে অগ্নি বলয়ের মুখে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে। সামরিক আইন বলবৎ,—দঙ্গল দঙ্গল রাইফেল ধারীদের কুইক মার্চে রাজপথ কাঁপে।

ত্রিনিদাদ সরকারের বড় ভরসাস্থল আমেরিকা ও ব্রিটেন। এরা এমন গণ-অভ্যুত্থানকে নিশ্চয় সুনজরে দেখে না। ত্রিনিদাদ সরকার তাই সকাতর অনুরোধ রেখেছেন,—অস্ত্র দিন, স্বেচ্ছাসেবক পাঠান, আপনাদের মদৎ পেলে গণরোষকে থেঁতলে দিতে আমার বেশী সময় লাগবে না। আবেদন গিয়ে পৌঁছলো তিনটি দেশে,—নাটের গুরু আমেরিকা, বেনিয়া ব্রিটেন এবং মদগর্বী ভেনিজুয়েলা।

তিনটি দেশই সাথে সাথে সাড়া দিয়েছে।

তরিঘড়ি অস্ত্রসম্ভার এসে ভিড়লো ত্রিনিদাদের ঘাটে।

দোলো ক্যারিবিয়ানকে তোলপাড় ক'রে ছুটে এলো ছ'টি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ। তিনটি এসে থামলো ত্রিনিদাদে, আর তিনটি টোবাগোতে। দুটি বৃটিশ জাহাজ ও একে একে এসে ভিড়লো জ্যামেইকা ও গায়েনায়।

ব্রিটেন শুধু অস্ত্র পাঠিয়ে খান্ত নয়, হাজার খানেক জবরদস্ত ইংরাজ সেনা ও পাঠিয়েছে, কালো দেহের লাল রক্তে ইউনিয়ন জ্যাক রঞ্জিত করবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয়। বিশেষতঃ কমনওয়েলথের সদস্য ত্রিনিদাদকে এখনো তারা তাদের অছি অঞ্চল বলে মনে করে।

আর মার্কিন অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের দারুন স্ফূর্তি,—আর একটা ছোট খাটো বাজার পাওয়া গেল। গণ্ডগোল যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, তাদের তুঙ্গে বৃহস্পতি ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হরেক রকম অস্ত্র

পাঠিয়েছে তারা, দু'টি জাহাজ ছাড়াও বিরাট বিরাট প্লেন থেকেও নামানো হচ্ছে প্যাক করা সেই সমস্ত অস্ত্র,—ন্যাপামবোমা, মর্টার, গ্রানেড, মেশিনগান, টমি গান ইত্যাদি ইত্যাদি। ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অব স্পেনে মার্কিন রাজপুরুষদের এখন জোর আদর আপ্যায়ন চলেছে। বেছে বেছে সুন্দরীদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে ওদের পিছনে, অনেক রাত অবধি চা চা, শ্যেক-শ্যেক, গো গো নাচ চলেছে, শ্যাম্পেনের ফোয়ারা ছুটছে টেবিলে টেবিলে।

ভেনিজুয়েলাও পাঠিয়েছে একদল জঙ্গী নায়ককে, মেশিনগান বুকে চেপে পোর্ট অব স্পেনের রাজপথে গলিপথে ইতি উতি ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা।

ত্রিনিদাদ তো সাদাদের শাসিত কালোদের রাজ্য আজকাল কালোরা জাগছে। দাবী জানাচ্ছে নিজের অধিকারের, তাদের মধ্যে যাদের অভিব্যক্তি কিছুটা মারমুখী, সঙ্গীরা তাদের নাম দিচ্ছে Black Panther.

এমন বহু কালো হায়না ত্রিনিদাদে ছিল। এবার ওদের সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে। তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাদাদের দুর্বিবহুল দেহের উপর।

ত্রিনিদাদ অধিবাসী কালোদের দুটী স্তরে ভাগ করা যায়,—নিগ্রো এবং তোমাদের ভারতীয় বংশদ্ভূত।

প্রধানমন্ত্রী স্যার এরিক উইলিয়ামস্ নিজে কিন্তু একজন নিগ্রো! ভাবতে খুব অবাক লাগছে, না? এরিক নিজে নিগ্রো হয়েও স্ব-জাতির বিরাগভাজন হলেন কেন? এরিকের জীবনী ও কার্যধারার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র আলোচনা করা যাক। তাহলেই, আসল কারণ খানিকটা ধরা যাবে।

এরিক্ উইলিয়মস্ পোর্ট অব স্পেনের সংগ্রাম-মুখর জনতার দিকে

জ্বালাভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। তার পদত্যাগ দাবী নিয়ে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা বের হচ্ছে। ফেষ্টুনে ফেষ্টুনে দেশটা ছেয়ে গেল। মাঝে মাঝে শেল ফাটছে, মেশিনগান গর্জন করছে, রক্তের ফোয়ারা ডাকছে। সবকিছুকে ছাপিয়ে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে সেই রবঃ "Down with Erick Williams! Down..."

গদি রাখা যাবে না বলে মনে হয়, এরিক হয়তো ভাবছেন। স্বচ্ছন্দে চলতে চলতে হঠাৎ যেন এক গভীর গাড্ডার মধ্যে পড়ে গেলেন। ব্ল্যাক পাওয়ার আন্দোলন যে গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে একে আর সামলানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমেরিকা, ব্রিটেন, ভেনেজুয়েলা, কানাডা ইত্যাদির কাছে সকাতর অনুরোধ করলেন এরিক, 'অস্ত্র পাঠান! পাঠান স্বেচ্ছাসেবক! আমি প্রায় অসহায় হয়ে পড়েছি!'

অথচ, কয়েক বছর আগেই এরিক উইলিয়মস্ এমন অসহায় ছিলেন না।

গণ-সমর্থনের শীর্ষে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। নিজের প্রগতিশীল ভাবধারার জন্য অভিনন্দিত হয়েছেন জনতার দ্বারা বারবার। নিজে সাহিত্যিক, অর্থবিজ্ঞানী,—তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ কলমের ধার অসাধারণ। দীর্ঘদিনের প্রয়াসে নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একখানা বিখ্যাত বই লিখেঃ Capitalism and Slavery. ধনতন্ত্রবাদ ও দাসপ্রথা! বিখ্যাত বই! ধনতন্ত্রবাদের নগ্ন, নির্লজ্জ, পাশবিক চরিত্রকে তিনি এখানে চমৎকার ভাবে এঁকেছেন!

ভাবতে অবাগ লাগে, Capitalism and Slavery এর লেখক এরিক উইলিয়মস্ কীভাবে ধীরে ধীরে ঐ ধনতন্ত্রেরই স্তাবক হয়ে উঠলেন। আমেরিকার এক নম্বর গুণাগ্রাহী লোক হলেন তিনি।

এর কারণ কি?

জন্ম তাঁর ১৯১১ সালে। সাধারণ নিগ্রো পরিবারের সন্তান।

অসাধারণ মেধা। ত্রিনিদাদে শিক্ষা সমাপ্ত করে এলেন ইংল্যাণ্ডে। ভর্তি হলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রত্যেকেই তাঁর মেধা ও কৃতিত্বে মুগ্ধ। ইতিহাসের কৃতি ছাত্র,—অক্সফোর্ড থেকে ইতিহাসে ডক্টরেট হলেন।

তারপর রুটির সন্ধানে যেতে হলো আমেরিকায়। ওয়াশিংটনের হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হলেন। অল্পদিনেই অধ্যাপক হিসাবে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একটানা 'ন' বছর ছাত্র পড়িয়ে ক্ষান্ত হলেন এরিক।

তাঁর দেশ ত্রিনিদাদ-টোবাগোর জন্য কিছু করা দরকার।

ফিরে এলেন নিজের দেশে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন তপ্ত রাজনীতির আবর্তনে। 'জাতীয় মুক্তিদল' গঠিত হলো তাঁর হাতে। হাজার হাজার মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে এরিক হলেন মুক্তিকামী ত্রিনিদাদের এক গৌরবোজ্বল নেতা!

১৯৫৮ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ফেডারেশান গঠিত হলে এরিক উইলিয়মস্ হলেন ত্রিনিদাদ-টোবাগোর প্রধান মন্ত্রী। ১৯৬২ সালে দেশ পরিপূর্ণ স্বাধান হবার পরও উইলিয়মস্ই রয়ে গেলেন এর প্রধান মন্ত্রী।

কিন্তু দীর্ঘদিন ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার সাথে সাথে এরিকের মতবাদও পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। আমেরিকার বৈভব ও চোখ-ধাঁধানো প্রাচুর্য এরিকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তিনি সম্পূর্ণ ইঙ্গো-মার্কিন জোটের তাঁবেদারে নিজের স্থান করে নিলেন। ব্রিটিশ ও মার্কিন স্বার্থরক্ষাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ালো। আর ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে এদের স্বার্থ এত বেশী যে, কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তই ইঙ্গো-মার্কিন জোটের স্বার্থবিরোধী হয়ে উঠতে পারে না। কার্যতঃ ত্রিনিদাদ-টোবাগো এখনো সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অছি অঞ্চল হয়ে আছে। আর এরিক সেই ব্যবস্থাকেই মেনে নিতে চান।

এরিকের এই হীনমন্যতার বিরুদ্ধে দেশের কালো মানুষেরা আজ সংগ্রাম-মুখর। এরিক ব্যর্থ! দীর্ঘদিন হাতে ক্ষমতা রেখেও পারলেন না তিনি, সাম্রাজ্যবাদী চক্রকে ত্রিনিদাদের বুক থেকে হটিয়ে দিতে। এ দেশের অর্থনীতি সবটাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কবলে। বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা গ্রাস করে নিয়েছে ত্রিনিদাদের সমস্ত উন্নয়মান সম্ভাবনাকে।

এখানকার বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি সবই প্রায় কানাডীয়দের হাতে। তেল ব্যবসায় একচেটিয়া হলো মার্কিন পুঁজিপতিরা।···বিক্ষোভকারীরা তাই প্রথমেই এদেশের ব্যাঙ্ক আক্রমণ করেছে, অফিস তচনছ করে দিয়েছে। আক্রমণ করেছে আমেরিকান ফার্মগুলিকেও। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পেট্রলের গুদামে। লেলিহান আগুনের সেই ভয়াবহ বিস্তার কল্পনাতীত। এমন কি, রোমান ক্যাথলিক চার্চগুলিও হামলার হাত থেকে রেহাই পায় নি।···

সেনগুপ্ত, তোমায় যখন এত সব গরম সংবাদ দিচ্ছি, বাইরের প্রকৃতি কিন্তু তখন একান্তই পেলব ও সৌম্য। ক্যারাবিয়ানের বুক থেকে এক টুকরো মেঘ ভেসে এসেছিল। পোর্ট অব স্পেনের মাথার উপর সেই ঘোর কৃষ্ণ মেঘ ক্রমশই বিস্তারিত হয়ে এসেছে। তারপর শুরু হলো বৃষ্টি। ইলশেগুড়ি বৃষ্টি। রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ শব্দ। ফোটা ফোটা মুক্তো জলের টুপুর টাপুর নাচ।

একজন সৈনিক কাম ডিপ্লোম্যাটের জীবনে কবিত্ব করবার অবকাশ কম। তবু এমন মেঘলা দিনে আমার বিশেষ করে মনে পড়ে যায় নিগ্রো মেয়ে জুলিয়ার কথা। জুলিয়া কনস্টাইনটাইন।

জুলিয়া কল গার্ল। ত্রিনিদাদে পরিচয় হয়েছিল। পরিচয়ও বেশী দিনের নয়। মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের পরিচিত। তবু এর মধ্যেই সে আমার মনে স্থান করে নিয়েছে। সহজে এ স্মৃতি মুছবে বলে মনে হয় না।

জুলিয়া এখন পোর্ট অব স্পেনের ডঃ জনসন-ক্লিনিকে আশ্রয়

নিয়েছে। যৌন রোগের বীভৎস আক্রমণে ওর নিটোল দীর্ঘ শরীর যেন কুঁকড়ে পড়েছে। কোঁচকানো হাত, ঝুলে পড়া ঠোঁট, চোখ দুটোতে লাল লাল রেখা,—দেখলে গা ঘিন ঘিন ক'রে ওঠে। তবু আমি দু'দিন ঐ ক্লিনিকে গিয়েছিলাম জুলিয়াকে দেখতে। ডাক্তার-নার্স সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন আমার দিকে। আমি সে সব ভ্রূক্ষেপ করিনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছি যৌন বিভাগের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। জুলিয়ার গলিত মসীকৃষ্ণ দেহের পাশে গিয়ে বসেছি। মাথার কাছে নামিয়ে রেখেছি আপেল ও ফুল। জুলিয়া অনেক কষ্টে তাকিয়েছে আমার মুখের দিকে। কী যেন বলতে চাইছে। পারছে না। শুধুই যন্ত্রণা ক্লিষ্ট ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথরিয়ে। সেই মুহূর্তে তাকিয়েছি পোর্ট অব স্পেনের চলমান জনসমুদ্রের দিকে। একাধিক দীর্ঘদেহী মার্কিন সৈনিকের সদম্ভ চলাফেরা আমার দৃষ্টি এড়ালো না। আমার হাত দুটো আপনা হতেই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। আমি উঠে দাঁড়াই।···

জুলিয়া কনস্টাইনটাইনের সাথে কী ভাবে পরিচয় হয়েছিল, বলছি। ঠিক দু' সপ্তাহ আগে 'ডুমা রেঁস্তোরায়' গিয়েছিলাম মনের খেয়ালে। এক ফরাসী মহিলা ১৯৩০ সালে ভাগ্যান্বেষে পোর্টে অব স্পেনে এসে ঐ রেঁস্তোরাটি খুলে ছিলেন। আগে ওর এমন বিস্তৃতি ছিল না। আজকাল বনেদী হোটেলের অন্যতম এটি। ডুমা নাম দেখে আলেকজেন্দার ডুমার কথা মনে পড়ে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, হোটেলে ঢুকবার পথেই আলেকজেন্দার ডুমার একটি মাঝারি সাইজের প্রস্তর মূর্তি চোখে পড়ে। ফরাসী মহিলা নিশ্চয় ডুমার একনিষ্ঠ পাঠিকা ছিলেন!

ডুমা রেঁস্তোরায় দেশী-বিদেশীর সমাগমে সবসময় এক জমজমাট ভাব। আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, সময় সময় এ সব জায়গায় না এসে পারি না। দেহকে শীতল করতে, মনের উপর প্রলেপ দিতে আমাকে ছুটে আসতে হয় এখানে।

বারগেণ্ডী আমার খুব পছন্দ। হুইস্কির চেয়ে বারগেণ্ডী আমায় বেশী আনন্দ দেয়। নীরবে বসে চেখে চেখে বারগেণ্ডী খাচ্ছি। একটু রঙ ধরে এলেই নিশাসখীদের উপর আমার দৃষ্টি ঘুরতে থাকে,—সাদা পীত এবং কালো। তিন রকমের প্রজাপতি রয়েছে এখানে।

বয়টি খুব চালাক এবং বেশ চটপটে। আমার মনোভাব বুঝতে পেরেই নীচু হয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে: May you have a nice time sir? আনকরা বিদেশী মাল আছে।...বলুন, কোন দেশী চাই? ফরাসী আমেরিকান অথবা সুইস?...'

'না-না।'

—আমি মাথা নাড়তে থাকি। আমি কোন ফরাসী, আমেরিকান অথবা, সুইস কল গার্লের সন্ধান করছি না আমি বরং চাই, এক ক্যারাবিয়ান ললনাকে। একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নিগ্রোকন্যার সাথে পরিচিত হতে চাই। গায়ের রঙ নিয়ে, পোশাকের চাকচিক্য নিয়ে আমার বাবু কোন মোহ নেই,—ভেতরে তো সেই একই এনাটমী!

বয় বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু দমে যায়নি। হোটেলের এক ঝকমকে গোপন ঘরে জুলিয়ার সাথে মোলাকাৎ করিয়ে দিয়েছিল।

সেই প্রথম দেখলাম জুলিয়া কনস্টাইনটাইনকে। দুগ্ধ ফেনিল শয্যার উপর বিছিয়ে দিয়েছিল তার দীর্ঘ দেহ। পাতলা ভেলভেট ঠেলে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল তার বিরাট পাছা, প্রসারিত জানু এবং অতলান্ত বস্তিদেশ। সমস্তই আমার দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত। তবু, ভাই, বলতে পারবো না, কেন যেন আমি হিম হয়ে গেলাম জুলিয়ার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে। আমার এতক্ষণের তপ্ততা কোথায় যেন উবে যায়। আমার মনে হলো, ফেনিল সমুদ্রে যেন একখণ্ড কালোদ্বীপ ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে পড়ে গেল আমাদের দেশের এক প্রাচীন প্রবাদ:

"যে নারীর চোখে দেখলে প্রেম,
সে নারীর উপর নিছক লালসা রেখো না।"

জুলিয়াও কিন্তু বিস্মিত হয়েছিল। বিস্ময়ের সাথে সামান্য বিরক্তিও জেগেছিল তার মনে। যেন অনেক কষ্টে উঠে বসলো। ওর প্রথম কথা হলো : আপনি তো আমেরিকান নন! তবে কেন নিজের এমন সর্বনাশ করছেন?···জানেন, আমার রক্তে কি সাংঘাতিক রোগ এসে বাসা বেঁধেছে!

কে যেন চাবুক মারলো আমাকে। সভয়ে তু' পা পিছিয়ে এলাম। মুখে আঙুল দিয়ে জুলিয়া হেসে উঠলো হিস্ হিস্ করে। তারপর এগিয়ে এসে আমাকে হাত ধরে বসালো বিছানায়। আমার পিঠে-বুকে আলতো আঙুল বোলাতে লাগলো। আবেশে আমার যেন ঘুম পায়!

সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেই আমি শুনলাম ক্যারাবিয়ান কল গার্ল জুলিয়া কনস্টাইনটাইনের বিচিত্র আত্মস্মৃতি! আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হলো সমৃদ্ধ। মানুষের প্রতি আরো বেশী বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং ঘৃণায় বুক ভরে উঠলো।

অভাবের তাড়নায় জুলিয়া কলগার্ল হয়নি। হয়েছে ওর সংগ্রামী সচেতন মনের লেলিহান শিখায়। ও বেছে বেছে দেহ দান করে শুধুমাত্র মার্কিন সৈন্যদের। নিজের শরীরের বিষ প্রবেশ করিয়ে দেয় ঐসব সামরিক অফিসারদের। কিছুদিনের মধ্যেই ওরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রত্যেকে অনুভব করে দারুণ জ্বালা। যৌবন হয়ে আসে নিরানন্দ। পাগলা কুকুরের মতো দাপাদাপি শুরু করে দেয়। শরীরের চামড়া কুঁকড়ে আসে। পচন ধরে নিম্নাঙ্গে। সিফিলিস অথবা গণরিয়ার অসংখ্য রিপু কিলবিলিয়ে ওঠে দেহের ভিতর। ডাক্তারের কাছে ছুটে যায়। অসহায় হয়ে শুয়ে থাকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। ক্রমশ দৈহিক জ্বালা থেকে মুক্তি পেলেও আর মানসিক স্ফূর্তি খুঁজে পায় না। এক বিরাট অভিশপ্ত জীবনবোধ নিয়ে সে পরিণত হয় এক অক্ষম সৈনিকে।···

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বেশ কিছুটা ক্ষতি করতে পারছে বলে জুলিয়ার সে কী আনন্দ! কালোদের উপর একটানা সাদাদের অত্যাচারের এমন ভাবেই প্রতিশোধ নিতে চায় সে। আমাকে সমস্ত কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল জুলিয়া। আবার ঠিক তেমনি হেসে উঠেছিল সাপের শিঁষের মতো হিস্ হিস্ শব্দে।

হাসতে হাসতেই যন্ত্রণার ছায়া মেলে ধরলো দুটো চোখ। চোখের কোন টেনে আমাকে দেখালো, বললো: কিন্তু আমি নিজেই যে শেষ হয়ে এসেছি বন্ধু! আর পারছি না, সহজ ঋজুতায় নিজের যোনিদ্বার উন্মুক্ত করে দিতে! দারুণ জ্বালা! দারুণ দাবদাহ!...

সেনগুপ্ত, বলো, এমন মেয়েকে আমি কি করতে পারি? ঘৃণা করবো? শ্রদ্ধা করবো? না, ভালবাসবো?

জুলিয়া আর সত্যই পারছে না হোটেলে বা রেঁস্তোরায় গিয়ে মার্কিণ রাজপুরুষদের পৌরুষকে খর্ব করে দিতে। সে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে পোর্ট অব স্পেনের ডঃ জনসন-ক্লিনিকে। যৌন রোগের বীভৎস আক্রমণে ওর নিটোল দীর্ঘ শরীর যেন কুঁকড়ে পড়েছে। কোঁচকানো হাত, ঝুলে পড়া ঠোঁট, চোখ দুটোতে লাল লাল রেখা,—দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে।

তবু আমি দু'দিন গিয়েছিলাম ঐ ক্লিনিকে জুলিয়াকে দেখতে। ডাক্তার-নার্স সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন আমার দিকে। আমি সে সব ভ্রূক্ষেপ করিনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছি যৌন বিভাগের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। জুলিয়ার গলিত মসীকৃষ্ণ দেহের পাশে গিয়ে বসেছি। মাথার কাছে নামিয়ে রেখেছি আপেল ও ফুল। জুলিয়া অনেক কষ্টে তাকিয়েছে আমার মুখের দিকে। কী যেন বলতে চাইছে। পারছে না। শুধুই যন্ত্রণাক্লিষ্ট ঠোঁট দুটি কাঁপছে থরথরিয়ে।

সেই মুহূর্তে তাকিয়েছি পোর্ট অব স্পেনের চলমান জনসমুদ্রের দিকে। একাধিক দীর্ঘদেহী মার্কিণ সৈনিকের সদম্ভ চলাফেরা আমার

দৃষ্টি এড়ালো না। আমার হাতদুটো আপনা হতেই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। আমি উঠে দাঁড়াই।...

পোর্ট অব স্পেনে আমার অবস্থানের মেয়াদ বোধ হয় ফুরিয়ে এলো। কানাঘুষায় শুনছি, ফিলিপাইন যেতে হতে পারে। ভালোই হবে। রূপসী ম্যানিলাকে পূর্ণভাবে দেখবার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের।

প্রীতি নিবেদক

তোমার

সোলেমান ভাইয়া।

সোলেমান ভাইয়া,

তোমার চিঠিখানা মনের আবেগ নিয়ে কতবার যে পড়েছি, লিখে জানাতে পারছি না। জুলিয়াকে আমার শ্রদ্ধা জানাবে। আমার কাছে তিনি এক বিপ্লবী চরিত্রের নারী। এ ধরণের লেলিহান শিখা সংগ্রামী পৃথিবীর প্রবাহমানতায় সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে লীন হয়ে যায়, আমরা তাদের হদিশ পাই না।

আমাদের হোটেলের কিছুদূরে এক উচ্চমধ্যবিত্ত বাড়ীর একটি মেয়ের বিবাহ উৎসব চলেছে। ইমন সুরের সানাই মনকে আমার বেদনাতুর করে তোলে। বাতাসের দমকা স্রোতে সেই সুর লহরিকে মনে হয় কার যেন গোঙানি। থেকে থেকে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ঐ বাড়ীর নীচে সার সার অর্ধনগ্ন রুগ্ন নর-নারীরা গভীর আকুলতায় তাকিয়ে আছে এঁটো পাতার প্রত্যাশায়। এরা ভিখারী। ভাই, আমরা প্রায় একটা ভিখারীর দেশে বাস করছি। অনুন্নত দেশে

ধনতন্ত্র যে কি পরিমাণ বীভৎস হয়ে উঠতে পারে, ভারতবর্ষ তার নিদর্শন।

তুমি যখন সংগ্রামী ত্রিনিদাদের কথা বলেছিলে, আমার বুকের রক্ত তখন উত্তাল হয়ে উঠছিল। সর্বহারা নিপীড়িতরা যেন এমন ভাবেই জেগে ওঠে এবং চূড়ান্ত প্রত্যাঘাতে ধনতন্ত্রের অহমিকাকে গুড়িয়ে দিতে পারে।

কিন্তু একটা কথা, Black Panther বলতে যা বোঝায়, তার প্রকৃত অভিপ্রকাশ কিন্তু খোদ আমেরিকায় ইতিমধ্যে বহুবার ঘটে গেছে এবং ভবিষ্যতে বহুবার সেই স্ফুলিঙ্গ উঠবে বলেই বিশ্বাস।

আমার এক সহপাঠী বন্ধু এখন ফিনাডেলফিয়ায় কর্মরত। সম্প্রতি সে কলকাতায় এসেছিল। যাবার আগে দেখা করে গেছে আমার সাথে। তার মুখ থেকেই শুনেছি আমেরিকাবাসী কালোদের সেই সহিংস্র আন্দোলনের কথা।

মার্কিন সরকার আজ নানাদিক থেকেই বিব্রত। ভিয়েতনাম-লাওস-কম্বোডিয়ায় তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অতি নগ্ন ভাবেই প্রকাশ পেয়ে গেছে। সেই পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্ব-দেশে ও বিদেশে তীব্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভের মুখে নিক্সন যেন টাইফুনে দিশাহারা এক জাহাজ, ঝলকে ঝলকে জল উঠে ডুবে যাচ্ছে অতলে!

এমন এক বিপজ্জনক মুহূর্তে আমেরিকার চরম পন্থী নিগ্রোসংস্থা Black Panther এর প্রশাসনিক সক্ষমতাকে মরণ কামড় দিয়ে বসেছে।

তুমি পোর্ট অব স্পেনের কালোদের সংগ্রামের রূপরেখা তুলে ধরেছো।

আমি এখন প্রকৃত Black Panther দের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাইছি। কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে এ বিষয়ে তোমার ধারণা নিশ্চয়

আরো স্বচ্ছ ও বস্তুনিষ্ঠ। যদি কোন ভুল বা অসম্পূর্ণতা আমার লেখায় থেকে থাকে, আমাকে লিখে জানাবে।

মার্কিন সরকার কিছুদিন আগে 'কালো চিতা' দের সম্পর্কে এক সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। এতে প্রকাশ পায়, 'কালো চিতা' সংগঠনের সদস্য সংখ্যা মোটে বারোশত জন। এরাই আমেরিকার বিভিন্ন শহর ও শহরতলিতে ছড়িয়ে আছে। আপাতভাবে মনে হয়, মার্কিন সরকারের বিশাল শক্তিশালী পুলিশ ও গোয়েন্দাবাহিনী খুব সহজেই এদের দমন করতে পারে। বারো শত নিগ্রোকে অনির্দিষ্ট কাল কয়েদ করে রাখা মোটেই কঠিন নয়।

কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না।

'কালো চিতা' বা ক্ষুব্ধ নিগ্রো সমাজের মূর্ত অভিপ্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে। শোষিত নিগ্রোরা ওদের অপ্রত্যক্ষ সাহায্য করে চলেছে। অনেক নিগ্রোই কালোচিতাদের মধ্য দিয়ে নিজেদের যথার্থ মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে যেন।

সমীক্ষা সমাপন্তে একজন প্রবীন মার্কিন বিচারপতি বললেন: এদের [কালো চিতাদের] দৃঢ় বিশ্বাস যে, সহিংস আন্দোলন ছাড়া কালোরা কখনো তাদের নায্য অধিকার লাভ করতে পারবে না। সাদাদের অহমিকা কোনদিন কালোদের তা মঞ্জুর করবে না। সুতরাং এই চলতি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেবার সুযোগ-সন্ধানে তারা প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে।

পান্থাররা মনে করে, একদিন আমেরিকার সমস্ত নিগ্রোদের তারা এই বৈপ্লবিক সংগ্রামে নামাতে পারবে। আকাশ পানে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে চিৎকার করে তারা জানায়ঃ

"Seize the time! All power to the people."

কালো চিতারা তাদের হিংস্র অভিব্যক্তি নিয়ে যখন শ্লোগান দেয়, আমেরিকার মাটি তখন যেন আগামী কোন ভয়াবহ সম্ভাবনায় থর

থরিয়ে কাঁপতে থাকে :

Guns, baby, guns.

Kill the racist pig cops.

Kill Richard Nixon !

এরকম চরমপন্থী নিগ্রোদের ক্রম উত্থানকে মার্কিন সরকার আর উপেক্ষা করতে পারেন না। প্রতিটি কালো চিতা আধুনিক আগ্নেয়-অস্ত্রে সজ্জিত। আত্মরক্ষার নামে স্বয়ংক্রিয় পিস্তল কোমরে লটকিয়ে তারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। সামান্য বিপদের গন্ধ পেলেই ওরা মরিয়া হয়ে ওঠে, বেপরোয়া গুলি চালিয়ে সম্ভাব্য শত্রুকে খতম করে ফেলে।

হালফিল তপ্ত আমেরিকায় কালো চিতারা রীতিমত গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছে। ১৯৬৯ সালে এরকম পুলিশ-কালোচিতার সংঘর্ষে উনিশ জন সংগ্রামী নিগ্রো প্রাণ হারিয়েছে। চারজন মার্কিন পুলিশও প্রাণ দিয়েছে কালো চিতাদের অব্যর্থ বুলেটে।

সেই নিহত উনিশ জন কালো চিতার নাম ও ছবি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। এরা হলেন,—

(১) স্পারজেন উইনটার : বয়স মাত্র উনিশ। ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে প্রাণ হারান।

(২) জন হুগিন্স : একমুখ দাড়ি, দুর্দ্ধর্ষ কালোচিতা। বয়স তেইশ। ১৯৬৯ এর জানুয়ারীতে শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী দাঙ্গায় মেতে উঠতে প্রাণে হারাতে হলো পুলিশের গুলিতে।

(৩) ওয়ালটার পোপ : বিশ বৎসরের উৎসাহী ব্ল্যাক প্যান্থার সদস্য। বহু বর্ণবিদ্বেষী দাঙ্গায় তাঁকে সক্রিয় অংশ নিতে দেখা গেছে। অবশেষে লস এন্‌জেলে ঐ ১৯৬৯ সালেরই অক্টোবরে প্রাণ হারালেন মার্কিন পুলিশের গুলিতে।

(৪) এ্যালপ্রেনটাইস চার্টার : কালো চিতা সংগঠনের পুরনো

সদস্য এ্যালপ্রেনটাইসের বয়স ছিল ছাবিবশ। কঠিন চোখ-মুখে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা ফুটে উঠতো। ১৯৬৯ এর জানুয়ারীতে একদল শ্বেতাঙ্গ পুলিশের সাথে দীর্ঘক্ষণ পিস্তল-লড়াই চালিয়ে অবশেষে বুলেটবিদ্ধ হন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর প্রাণহীনদেহ ঢলে পড়ে।

(৫) সিলভেস্টার বেল : অপেক্ষাকৃত প্রবীন এই কালো চিতার চোখ দুটো খুদে খুদে, ভাঙা চোরা মুখে ক্রূঢ়তার স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৯ এর আগষ্টে স্যান ডিগোতে মার্কিন পুলিশ তাঁকে হত্যা করে।

(৬) ববি হুটন : এর বয়স ছিল মাত্র সতেরো। মাথায় উলের টুপি চাপানো ববি ছিল খুব ছটফটে এবং বেপরোয়া। ১৯৬৮ এর এপ্রিলে হাত বোমা নিয়ে অক্ল্যাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল একটি পুলিশভ্যানের উপর। কিন্তু তার আগেই মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি তার যৌবনদীপ্ত দেহটাকে একেবারে ঝাজরা করে ফেলে।

(৭) ষ্টিভ বার্থলোমিউ : একুশ বছরের সপ্রতিভ নিগ্রো যুবক। শ্বেতাঙ্গদের উপর সবসময়েই মারমুখী। ১৯৬৮ এর আগষ্ট মাসে লস এন্জেলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাতে হলো।

(৮) জন সেভেজ : এরও বয়স একুশ। ১৯৬৯ এর মে মাসে স্যানডিগোর রাস্তায় রীতিমত গেরিলা যুদ্ধে মার্কিন পুলিশের শিকার হন। অজস্র বুলেটে ক্ষতবিক্ষত দেহকে তাঁর তখন সনাক্ত করা দায়।

(৯) ফ্রাঙ্ক ডিভাস্ : ফ্রাঙ্ক ডিভাস্ অপেক্ষাকৃত প্রবীণ। বয়স প্রায় চল্লিশ। ব্ল্যাক প্যান্থারদের অন্যতম তাত্ত্বিক সদস্য। ১৯৬৮ এর এক বিষণ্ণ সকালে লং বীচের এক পার্কে তাঁর মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। কে বা কারা যেন তাঁর বুলেট বিদ্ধ দেহটিকে নামিয়ে রেখে গেছে ওখানে। এ খুনের কোন কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি।

(১০) ওয়েলটন আর্মসষ্টেড : বয়স মাত্র সতেরো। 'কালো

চিতা' সংঘের এক নবীন সদস্য। ১৯৬৯ এর অক্টোবরে জনৈক গোয়েন্দা পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান।

(১১) ফ্রেড হ্যামটন: চিকাগোর কালোচিতা ফ্রেড হ্যামটেন বক্তৃতায় আগুন জ্বালাতেন। দু' হাতে পিস্তল চালাতে প্রায় সব্যসাচি। ১৯৬৯এর ডিসেম্বরে চিকাগোর এক খোলা ময়দানে একদল আমেরিকান গার্ডের সাথে লড়তে গিয়ে প্রাণ হারালেন।

(১২) সিডনে মীলার: 'কালো চিতা' সংগঠনের অর্থ-সংগ্রহে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন একুশ বছরের বিশালদেহী নিগ্রো যুবক সিডনে মীলার। ডাকাতি করতে গিয়ে জনৈক ষ্টোরকিপারের গুলিতে মারা যান ১৯৬৯ এর নভেম্বরে।

(১৩) মার্ক ক্লার্ক: নিগ্রোদের মধ্যে বেশ সুপুরুষই বলতে হবে বাইশ বৎসরের যুবক মার্ক ক্লার্ককে। ১৯৬৯ এর ডিসেম্বরে চিকাগো শহরে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারালেন।

(১৪) টমী লিউস: ১৯৬৮ এর আগষ্ট মাস। লস এন্‌জেলে পুলিশ আর কালো চিতাদের মধ্যে বিরাট রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়ে গেল। সেই দাঙ্গায় প্রাণ হারালেন আঠারো বৎসরের সুদেহী নিগ্রো যুবক টমী লিউস।

(১৫) ন্যাথানিয়াল ক্লার্ক: বিচিত্র জীবন এবং বিচিত্রতর তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু। মাত্র উনিশ বছরের যুবক ন্যাথানিয়াল বোধ হয় কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি, তাঁর সুন্দরী সপ্রতিভা স্ত্রী শ্রীমতি ক্লার্ক আসলে একজন মহিলা গোয়েন্দা। ন্যাথানিয়ালকে সে শুধু বিয়ে করেছিল কালো চিতাদের সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য। ন্যাথানিয়াল যেদিন তাঁর স্ত্রীর স্বরূপ বুঝতে পারলেন, তখন আর তাঁর উপায় ছিল না। উপায় ছিল না আত্মরক্ষারও,—স্ত্রীর হাতে উদ্যত পিস্তল। লস এন্‌জেলে একটি সুদৃশ্য ফ্লাটে স্ত্রীর হাতে নিহত হলেন হতভাগ্য ব্ল্যাক প্যান্থার ন্যাথানিয়াল ক্লার্ক।

(১৬) লরি রবারসন: হাসিখুশী নিগ্রো যুবক লরি রবারসন কিন্তু মনে তাঁর শ্বেতাঙ্গবিরোধী বিক্ষোভ অনেকদিন ধরেই পুঞ্জীভূত। তারই অগ্নি-ঝলক অভিপ্রকাশ ঘটলো ১৯৬৯ এর জুলাই মাসে। চিকাগোর রাস্তায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারালেন।

(১৭) রবার্ট লরেন্স: ব্ল্যাক প্যান্থার রবার্ট লরেন্স মারা যান লস এন্‌জেলে পুলিশের গুলিতে [আগষ্ট, ১৯৬৮]।

(১৮) আর্থার মরিস: আঠাশ বছরের কালো চিতা আর্থার মরিস ছাত্র জীবনে কৃতি ছিলেন। কিন্তু উত্তরজীবনে চরমপন্থী নিগ্রো সংগঠনের সদস্য হলেন। ১৯৬৮তে লস এন্‌জেলে পুলিশ-নিগ্রো যে বন্দুক লড়াই চলেছিল, তাতে প্রাণ হারান আর্থার মরিস।

(১৯) এ্যালেক্স রেকলে: চব্বিশ বৎসর বয়সের নিগ্রো যুবক এ্যালেক্স রেকলে কালো চিতা সংগঠনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯ এর মে মাসে একদল শ্বেতাঙ্গ যুবক অতর্কিতে তাঁর বাড়ীতে চড়াও হয়। প্রচণ্ড অত্যাচার হয় তাঁর শরীরের উপর। তারপর আধমরা অবস্থায় তাঁর হৃদপিণ্ড ঝাজরা করে ফেলে একটির পর একটি বুলেট।

এই উনিশটি নিগ্রো প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছে আমেরিকায় কালোদের দাবী আদায়ে। এরা নির্মম। মৃত্যুও এঁদের মর্মান্তিক। আমেরিকার পথে প্রান্তরে, রাজপথে-জনপথে যেন ওঁদের অবাধ্য আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রতিহিংসার অন্ধত্ব নিয়ে।

কালোচিতার বন্য আক্রমণে অমোঘ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন মার্কিন পুলিশ-বিভাগের চারজন কৃতি অফিসারও। জন ফ্রে [২৩], ফ্রান্সিস র‍্যাপাপোর্ট [৩২], জন গিলহুলী [২১], নেলসন স্যাসের [২৪]।

চিকাগো এবং লস এনজেলকে কেন্দ্র করে কালোচিতাদের ঝড়

উঠেছে। ভয় হয়, একদিন ঐ ঝড় আমেরিকার সমগ্র আকাশ ছেয়ে ফেলবে। পুঁজিবাদী দেশগুলির নাটের গুরু আমেরিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ অনেক বিষ ও জ্বালা। একটানা শোষণের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে নিগ্রো সমাজ। আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত। যতদিন মার্টিন লুথার কিং জীবিত ছিলেন, ততদিন তবু অহিংস আন্দোলনের একটি সুসংবদ্ধ ধারা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। কিং কে হত্যা করে সেই সম্ভাবনাকে মুছে ফেললো চরমপন্থী মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়। আজ তাই রক্তের ঋণ শোধ করতে মারমুখী হয়ে উঠেছে প্রতিটি নিগ্রো 'ঘেঁটো'। আত্মপ্রকাশ করেছে দুটো ভয়াবহ নিগ্রো সংগঠন : (ক) ব্ল্যাক মুসলীম সম্প্রদায় এবং (খ) ব্ল্যাক প্যান্থার সংগঠন।

এ সম্পর্কে তো অনেক কিছুই বলবার অবকাশ আছে।··· কিন্তু সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে মার্টিন লুথার কিংয়ের সেই পবিত্র মুখখানা। আমার অন্তর নিঃসৃত সমস্ত বেদনা ও শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় এই শান্তির শহীদ নিগ্রো নেতার পদমূলে। ঘুরে ফিরে তাই সেই একই প্রশ্ন আসে : মানবিকতাকে হত্যা করবার জন্যই কি এই আধুনিক বাগাড়ম্বর যান্ত্রিক সভ্যতার নগ্ন বিস্তার? আমার পরের চিঠিতে কিংয়ের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করবো ···

আবার রাত ঘনিয়ে এলো।

রাত না ঘনালে আমার লেখা হয় না। আপন মনের কথা শোনাবার জন্য নৈশ স্তব্ধতা বড় প্রয়োজন।

জানো, আমাদের এই বনেদী হোটেলের বাগানে একবার একটা ভিখারী তার বাচ্চাকে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল। দারোয়ান টের পায় নি। আমরা ও টের পাই নি। হঠাৎ রাত গভীরে বিচিত্র কান্নার শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। দারোয়ান মট্রু সিং ঘাড় ধরে বাগান থেকে বের করে দেয় বাচ্চা সহ সেই অনাথ লোকটিকে।

নিয়ন লাইটের আলোয় আমি ওকে দেখেছিলাম। মানুষ নয়, প্রেতাত্মা। পি. সি. সরকারের ভূতের নাচে যেন এদেরই দেখতে পেয়েছিলাম। বসন বলতে কিছুই নেই। হাড় জির জিরে দেহ তার থর থরিয়ে কাঁপছে। শুধু বুকের মধ্যে লেপ্টে রয়েছে রিকেটী বাচ্চাটা। বোধ হয় বাচ্চাটার মা নেই। অথবা, মা অন্য কারুর আশ্রয়ে হারিয়ে গেছে। আমি ছুটে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। আমার সম্মান, আমার পদমর্যাদা, আমার মাঝারি ধরণের আয় আমাকে সবেগে বাধা দিল ডাষ্টবিন খোঁজা লোকটার প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখাতে।

আত্মপ্রবঞ্চনার গ্লানি নিয়ে বিছানা আঁকড়ে পরে থাকলাম বহুক্ষণ। ঘুম আর সহজে আসছে না। স্নায়ুগুলি ফুলে ফুলে উঠছে বার বার। থেকে থেকে যেন কানে ভেসে আসতে থাকে রিকেটী ভিখারী শিশুর কঁকিয়ে ওঠা শব্দ।

বিছানা ছেড়ে পর পর দুটো পিল খেয়ে নিলাম। অবশ হয়ে এলো হাত-পা। আমাকে যেন কাল নিদ্রায় গ্রাস করলো।

ঘুম ভাঙ্গলো অনেক বেলায়। তাও আবার বিশ্রী চেচামেচিতে।

নেমে এলাম নীচে।

তারপর দেখতে পেলাম সেই বীভৎস দৃশ্য!

ভিখারীর শিশুটি মরে পড়ে আছে আমাদের বনেদী হোটেলেরই বারান্দায়। বেশ বুঝতে পারা যায়, ওকে গলা টিপে মারা হয়েছে! চোখ দুটো ঠেলে বের হয়ে এসেছে যেন। নাকের ডগায় জমাট-বাধা কালচে রক্ত!

আমি চিৎকার করে উঠতে গেলাম।

কিন্তু পারলাম না। আবার আমার সেই বুর্জোয়া মানসিকতা কণ্ঠরোধ করলো। আবার আমার সেই তথাকথিত সম্মান, পদমর্যাদা, মাঝারি ধরণের আয় যেন ফিসফিসিয়ে উঠলো:

পালাও! এ সব নোংরা ব্যাপারে নাক গলানো তোমার সাজে না।

পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে আমি তরতরিয়ে উঠে এলাম উপরে।

বলতে পারো, এমন মানসিকতা আমাদের কবে দূর হবে? সর্বাধুনিক সংজ্ঞা মেনে নিলে আমিও তো সর্বহারাদের শ্রেণীভুক্ত। চাকুরিটাই আমার জমিদারি,—ওটা হারালে পায়ের নীচে মাটি থাকবে না। অথচ, শ্রেণী-সচেতনার বদলে আত্মপ্রবঞ্চনাটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটা বিরাট আঘাতের দরকার। একটা বৈপ্লবিক আঘাতের প্রয়োজন আজ ভারতবর্ষে। সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে ধনতন্ত্রের পাশব বিকাশ এখানে কল্পনাতীত। দুর্নীতির মালা গলায় দিয়ে আছেন তাঁরাই, যারা চাঁদির জুতোয় ভোটে জিতে গণ-নেতা বলে নিজেদের জাহির করেন। অসাম্যের প্রাচীর এখানে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

এর সমাধান কোথায়?

ভোট যুদ্ধে না, প্রকৃত বিপ্লবে?

তোমার চিঠির পথ চেয়ে আছি।

ইতি—

তোমার প্রীতিমুগ্ধ

সেনগুপ্ত।

প্রিয় সেনগুপ্ত,

বড় স্পর্শকাতর মন তোমার! চিঠির প্রথমাংশ পড়ে মনে হয়েছিল, আমেরিকার সাদা-কালো আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু

আসলে মন তোমার সুদূর প্রসারী এবং বিপ্লববাদের প্রতিষ্ঠা দেখতে উন্মুখ। আশা করছি, আজাদী ভারতের গ্লানি দূর করতে প্রকৃত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আর বেশী দেরী নেই। খামের উপর ছাপ দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমি এখন ম্যানিলায়। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা।

ম্যানিলায় এসেও দেখতে পেলাম সেই বারুদ! সেই অসন্তোষ। সেই বিক্ষোভ!

এখানেও মার্কিন-বিরোধী সংগ্রাম দারুন অনুরণন তুলেছে।

দেয়াল জুড়ে বিরাট বিরাট পোষ্টার ঃ

'খুনী নিক্সন ইন্দোচীন থেকে হাত গুটিয়ে নাও!'

'নয়া সাম্রাজ্যবাদের নয়া কবর কম্বোডিয়া!'

'দক্ষিণ ভিয়েতনামী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের নতুন দোসর কম্বোডিয়ার পুতুল নায়ক লোন-নোলের বিনাশ চাই!'

'সংগ্রামী মানুষের প্রেরণা চেয়ারম্যান মাও সে-তুং!'

'গোটা পূর্বদিক আজ লালে লালে লাল!'

ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিক্সনের কম্বোডিয়া-নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে ফিলিপাইনের যুব-মানস। আমেরিকা যে এখানেও তার হীন মনোবৃত্তির জন্য কতখানি ঘৃণ্য, ম্যানিলার যে কোন যুবকের সাথে পরিচিত হলে তা উপলব্ধি করা যায়। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নামে ওরা মাটিতে থুথু ফেলে। কুশপুত্তলিকা দাহ করে। পেন্টাগণকে মনের ঝালে গালাগাল দেয়।

কম্বোডিয়ায় মার্কিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে দারুণ গণবিক্ষোভ দেখতে পেলাম এখানে।

ম্যানিলায় মার্কিন দূতাবাসের সামনে যুব-ছাত্রদের সেই বিক্ষোভ এক দেখবার বস্তু। ওরা দীর্ঘক্ষণ ধরে দূতাবাসটিকে প্রায় অবরোধ

করে রাখে। আকাশ কাঁপানো শব্দে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। লাল-সাদা ফেষ্টুনে চারদিক ছেয়ে ফেলেছে।

বিক্ষোভকারী ছাত্ররা কম্বোডিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সপক্ষে এবং লোননোল বিরোধী ধ্বনি দিচ্ছিল।

হঠাৎ যেন সাইরেন বেজে উঠলো।

চকিতে দেখা গেল সাঁ সাঁ কতকগুলো কনভয় ছুটে আসছে। আসছে দঙ্গল দঙ্গল পুলিশ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ফিলিপাইন সরকারের পুলিশ বাহিনী।

মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়ে যায়।

শুরু হয় ছাত্র পুলিশ এক বিধ্বংসী দাঙ্গা।

এক পক্ষের হাতিয়ার ফেষ্টুনের লাঠি, সোডার বোতল, ইট, লোহার রড ইত্যাদি। অপরপক্ষ উন্মত্তের মতো লাঠি ঘোরাচ্ছে, আর থেকে থেকে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটাচ্ছে।

চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার!

ছাত্ররা প্রথমে মোটেই হিংস্র ছিল না।

কিন্তু পুলিশি পেষণে ওরা শেষে মরিয়া হয়ে উঠলো। ওদের সংগ্রামী মানসিকতা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো ম্যানিলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

বিক্ষুব্ধ জনতা যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিল।

রেল লাইন উপড়ে ফেলল। বৈদ্যুতিক তারগুলি ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ঝুলতে থাকে।

এক কথায় ম্যানিলা ফিলিপাইনের অপরাপর শহরগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।...

ম্যানিলার যুব-সমাজ তাদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ জানালো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এই সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘদিন ধরে কায়েম হবার

চেষ্টা করছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। নারকীয় অত্যাচার চালাচ্ছে ভিয়েতনামে, লাওসে এবং অতি সম্প্রতি কম্বোডিয়ায়। ঘৃণায় তিতিক্ষায় এখানকার মেহনতী জনতা তাই থুথু দেয় পেন্টাগণের মুখে।

আর ফিলিপাইন তো প্রকৃত অর্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি অছি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক—ছু'দিক দিয়েই আমেরিকার কাছে সে দাসখত লিখে বসে আছে।

এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত।

বনজ সম্পদের তো তুলনাই হয় না।···

দেশটি আগে ছিল স্প্যানিশদের দখলে। এখন এসেছে মার্কিনদের বুটের নীচে। প্রেসিডেন্ট ফার্ডিন্যাণ্ড মার্কস তাঁর মার্কিন-প্রেমে গদগদ ভাব। দেশের লোক তাঁকে ছু'চোখে দেখতে পারে না। শুধুই জঙ্গী-দাপটে নিজের গদি কায়েম রেখেছেন।

অথচ, জাতি হিসাবে ফিলিপাইনরা যথেষ্ট সাহসী এবং সচেতন।

ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবর চাইছে তারা।

আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে ফিলিপাইনে।

দেশের বুদ্ধিজীবিরা মার্কিন তাঁবেদারীর অবসান ঘটাতে আসরে নেমে পড়েছেন। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ীরা ক্রমশ সংঘবদ্ধ বিক্ষোভে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

ম্যানিলার প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'ম্যানিলা সানডে টাইমস'। র সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখতে পেলাম লিখেছে :

'···এশিয়ার অধিকাংশ মুক্তিযুদ্ধে সাফল্য অর্জন করলেও একমাত্র ফিলিপাইন এখনো সাম্রাজ্যবাদীদের মুঠোর মধ্যে দমবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।···'

এই সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ !

প্রচ্ছন্ন নয়া সাম্রাজ্যবাদ !···

সুখের বিষয় ফিলিপাইনের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন জানাচ্ছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবীরাও তাঁরা সেনেটে প্রশ্ন তুলেছেন : ফিলিপাইনের বুকে পেন্টাগণের এই জঙ্গী দাপট কেন ? কেন ফিলিপাইন থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে এনে আমেরিকা তাকে মুক্তি দেবে না ?

মজার কথা শোন, ফিলিপাইনে অবস্থিত মার্কিন ফৌজের সমস্ত খরচ খরচা ফিলিপাইন অধিবাসীদেরই বহন করতে হয়। এর জন্য প্রতি মাসে ব্যয় হয় দুই লক্ষ ডলার। এমন চমৎকার ব্যবস্থা আমেরিকা আর কোথায়ও করতে পারে নি। পারলে তো সে ভিয়েতনাম-যুদ্ধ আরো এক দশক ধরে চালাতে পারতো।

আজকের আমেরিকার আসল ব্যথার উৎস, তার ডলার দুর্বল হয়ে পড়ছে! দেশের কর-পীড়িত মানুষগুলিও খুব সচেতন হয়ে উঠেছে !···

সেনগুপ্ত, ম্যানিলাকে মনে হবে যেন এক পটে আঁকা ছবি। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, মখমলের মতো নরম সবুজ পার্ক, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফোয়ারা, মাঝে মাঝে প্যাগোডাগুলি আকাশ পানে মুখ তুলে রয়েছে।

বেশ আমেজ লাগছে এখানে আসবার পর। সামুদ্রিক বাতাসের ঝাপটায় একটু যেন ঘুম ঘুম ভাব। এক সুইস্ কুটনীতিবিদের সাথে আলাপ হলো। নাম তাঁর হেইগ। ভদ্রলোক প্রথম জীবনে খুব ভালো স্কি-প্লেয়ার ছিলেন। খেলতে গিয়েই খেলিয়ে তুললেন আর এক মহিলাকে। জীবন-সঙ্গিনীকে পেয়ে বিলকুল ভুলে গেলেন সব। সংসার আর রাজনীতি, রাজনীতি এবং সংসার নিয়ে মেতে

অবশ্য আমার সঙ্গে যতটুকু পরিচয়, তাতে হেইগের রাজনৈতিক

চিন্তাধারা খুব একটা স্বচ্ছ বলে মনে হলো না। সব কিছুই ডায়েরিতে লিখে রাখবার বাতিক আছে। তারপর যেন সেই লিখিত কথাগুলিই বড় বড় করে বলে বেড়ান। দাঁতে দাঁত চেপে বিড় বিড় করে কথা বলেন। দেখতে যেন মুড়ো ঝাঁটার মতো। রোগা ঢ্যাঙা। চিমসে লম্বা মুখ। অনেকদিন আগে টাইফাসে ভোগার দরুণ এখনো মাথার চুলে কদম ছাঁট দেওয়া।

কিন্তু ওর শ্রীমতিকে দেখো,—যেন ছোটখাটো একটা বাড়ি, বারান্দার মতো উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বুকের দুই মাংস পিণ্ড। তারই উপর কাচুলির প্রচণ্ড শক্ত বাধন দেখবার বস্তু।

সব সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খিট মিট লেগেই আছে।

এক এক সময় তো মনে হয়, এই বুঝি ওদের উনিশ বছরের পারিবারিক-জীবনে বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এলো। কিন্তু তা হয় না। আবার থিথিয়ে আসে নিঃসন্তান এই সুইস্ দম্পত্তি।

কিন্তু একদিনের ঘটনায় আমি বুঝতে পারলাম, হেইগ-দম্পতির হাহাকারটা কোথায়।... সেদিন সন্ধ্যায় আমি প্রথম হেইগের কোয়ার্টারে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখেই শ্রীমতি হেইগ্ কেমন যেন চমকে উঠলেন! চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। আমার কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহে হঠাৎ বলে উঠলেন: বাছার বয়স তে বেশী নয়,—পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে নিশ্চয় হবে?

আমি হতবাক।

মিঃ হেইগ নিদারুণ ধমকে উঠলেন বৌকে: লোকের সাথে কথা বলতে জানো না?

উনি একজন সম্মানীয় লোক। বাছা—বাছা করতে আরম্ভ করেছে—

শ্রীমতি হেইগের চোখ দুটো তখনো ছল ছল করছে। স্বামীর

দিকে ফিরে ভাঙ্গা গলায় বললেন: আমি কী খারাপ বললাম? আমার টম বেঁচে থাকলে ওরই মতো হতো।...

এই হলো বেদনা। এটাই ওদের মধ্যকার শূণ্যতা ও তিক্ততার উৎস।

সেদিন সন্ধ্যায় একর্ডিয়নটা বুকের উপর এনে দোলাতে দোলাতে বাজাতে লাগলেন হেইগ। দূরকে আপন করে নিচ্ছে যেন সেই সুর তরঙ্গ। ভাবে আপ্লুত আমি নিস্তব্ধ, নিশ্চল।...

ফিরে এলাম রাত গভীরে। এসেই তোমায় এই চিঠি লিখলাম। রাতে চিঠি লেখা আমারও অভ্যেস।

প্রীতি সহ—
তোমার সোলেমান ভাইয়া

সোলেমান ভাইয়া,

শূণ্য দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। সময় সময় মন আমার হয়ে ওঠে ফেরারী সিপাহী। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে হারিয়ে যেতে চাই, সীমাহীন প্রান্তরে। উঠবে মরু-ঝড়। বিদেশী বাতাস গোঙাতে গোঙাতে বার বার আছড়ে পড়বে আমার উপর। তবু ধূলি ধূসরিত এই আমি ছুটে চলেছি,—শুধুই ছুটে চলেছি।

সম্প্রতি আমি পল রবসনের খান চারেক রেকর্ড উপহার পেয়েছি এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে। রাত যখন গভীর হয়, আমি আবেশে ঐ ঘূর্ণ্যমান চাকতিগুলির উপর কান পাতি। যেন নিজেরই প্রাণের আকুতি শুনতে পাই সেই খাঁদ গম্ভীর সুর-তরঙ্গে। মিড়-গমক-মূর্চ্ছনার ব্যাকরণ খুঁজতে যাওয়া তখন বাতুলতা। মনে

হয়, আমার আত্মা যেন গান গাইছে। কথা বলছে সাঙ্গীতিক প্রকাশে।

সত্যি রবসনের গান শুনলে নিগ্রো প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আপনা হতেই নত হয়ে আসে। গান এবং নাচে তাদের আজন্ম সহজাত অধিকার। এরা সুখেও নাচে, দুঃখেও নাচে। ম্যাসাচুসেটে আমি একবার এক সদ্য সন্তান হারা নিগ্রো মাকে নাচের মাধ্যমেই দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেছিলাম। অবিস্মরণীয় দৃশ্য! কোনদিন ভুলতে পারবো না।

নিগ্রোদের কথা উঠলেই মনে পড়ে যায় আমেরিকার গান্ধী ডঃ মার্টিন লুথার কিংয়ের কথা। গান্ধী তবু শহীদ হয়েছিলেন পরিণত বয়সে। কিন্তু মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে মার্টিনকে সরে যেতে হলো এই পৃথিবীর বুক থেকে। ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড! চরমপন্থী শ্বেতাঙ্গ ঘাতক অপূরণীয় ক্ষতি করে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

আমি তো বলবো, কিংয়ের হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন মার্কিন সরকার। কিং বেঁচে থাকলে হয়তো নিগ্রো আন্দোলন এমন সহিংস হয়ে উঠতো না। আজ তাঁর মৃত্যুতে সাদা-কালোর লড়াই এক রক্তাক্ত সম্ভাবনার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ব্ল্যাক-প্যান্থার এবং কৃষ্ণ মুসলীমদের চরম প্রত্যাঘাত এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৮ আমেরিকার মেমফিস শহরে আত্মাহুতি দিলেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব, শান্তির একনিষ্ঠ পূজারী এবং নিগ্রোদের প্রধান নেতা মার্টিন লুথার কিং। সেই দিনই অনুভূত হয়েছিল, আমরা এক কবন্ধ যুগে বাস করছি। ধনতান্ত্রিক অহমিকা শুধুমাত্র অসাম্য আনে না, মানবিকতাকেও হত্যা করে।

কিংয়ের জীবন এবং রাসেলের দর্শন আমাকে সবচেয়ে নাড়া দিয়ে

যায়। মনে পড়ে ১৯৬৪ সালের ১৪ই অক্টোবরের কথা। আমি তখন আমেরিকায়,—ফিলাডেলফিয়া শহরের বাসিন্দা। থাকি ১৩০৮ স্প্রুস স্ট্রিটে। নিগ্রো বন্ধু বেরিন বেন্থাম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, ডঃ কিংয়ের শান্তিতে নবেল পুরস্কার লাভের কথা। প্রতিটি কাগজ জুড়ে কিংয়ের প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে,—শান্তির দূত নিগ্রো নেতা তাঁর উপযুক্ত স্বীকৃতি পেয়েছেন !

মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে নবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ডঃ কিং-ই এই পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। পুরস্কারের অর্থমূল্য চুয়ান্ন হাজার ডলার। কিং এই সমস্ত টাকাটাই নিগ্রো-সংগ্রাম তহবিলে দান করে দিলেন। যে অধিকার লাভের জন্য তাঁর একনিষ্ঠ সংগ্রাম, তাকেই আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার জন্যই যেন কিং নবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। নরওয়েতে পুরস্কার আনতে চললেন কিং। নরওয়ের অস্‌লো শহর !

একখানা বিশেষ বিমানে করে কিং উড়ে চললেন অস্‌লোর উদ্দেশ্যে। বিমানে শুধু কিং একা নন, তাঁর পরিবারের সকলে। স্ত্রী, মা, বাবা, ভাই, বোন। আর আছেন কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সংগ্রামী বন্ধু।

অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হলঘরে কিংকে বেষ্টন করে সেই আনন্দ-উজ্জ্বল নিগ্রো নর-নারীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই মুহূর্তে ছায়াছবির মতো তাঁদের মনের পর্দায় হয়তো থরথরিয়ে কাঁপছিল বহু বৎসর ব্যাপী সংগ্রামের স্মৃতি !

সেই সভায় উপস্থিত আছেন রাজা অল্যাফ্। আছেন বিশ্বের বহু খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং সাহিত্যিক বৃন্দ।

উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন ডঃ জ্যান। তিনি বললেন ঃ

'...পশ্চিমী দুনিয়ায় ডঃ কিংই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রমাণ করলেন, অহিংস উপায়ে সংগ্রাম চালানো যায়। এ

সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ধারণাকে তিনি পরিবর্তিত করে ফেলেছেন !···'

একটু থেমে ডঃ জ্যান আবার বলতে শুরু করলেন :

'ডঃ কিং শান্তিবাদী নেতা হলেও, তাঁর উপর অনেক হিংস্র প্রতিশোধ এ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি কৃষ্ণ জাতির অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামে নেমেছিলেন। এরজন্য তাঁকে বহুবার কারারুদ্ধ করা হয়েছে, তাঁর গাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের প্রাণের ভয় দেখানো হয়েছে। তবু পর্বতের ন্যায় অটল ডঃ কিং কোনদিন তাঁর আদর্শ ও সংগ্রামের পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন নি।'

কিং নরওয়ের রাজা অল্যাফের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করলেন। উচ্ছ্বসিত হাততালিতে মুহূর্তে বিরাট হলঘরখানা মুখরিত হয়ে ওঠে। কিংয়ের মুখাবয়ব প্রশান্ত, দৃঢ় মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। শোনা গেল তাঁর খাঁদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর :

'···আমি এক বিশেষ মুহূর্তে এই পুরস্কার পেলাম। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২ কোটি ২০ লক্ষ নিগ্রো মুক্তির আলো খুঁজছে। বর্ণ-বিদ্বেষের সুদীর্ঘ অন্ধকার ঘুচিয়ে তারা এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে চলেছে। আমি সেই আন্দোলনেরই স্বার্থে এই পুরস্কার গ্রহণ করছি। যে আন্দোলন নিগ্রো জাতির স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাকে সর্বোতভাবে জোরদার করে তুলতে হবে !—'

'—আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি ব্যক্তিগত আনন্দে নয়, আমি অনুভব করছি এক সমষ্টিগত আনন্দ,—কারণ নিগ্রো জাতির একজন প্রতিনিধি হিসাবেই আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি।

বিমান বন্দরে রানওয়ের উপর দাঁড়িয়ে বহু শ্রমিকের নিরলস

পরিশ্রমেই যে কোন একটি বিমান অকাশে উড়তে পারে। আমিও সংগ্রামের সাধারণ কর্মীদের বিরাট সমর্থনে এই পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছি। এই সম্মান তাই শুধু আমার একার নয়, এতে সম্মানিত হবেন সেইসব সাধারণ কর্মীরাই !···

আপনারা জেনে রাখুন, আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ নিগ্রো আজো মুক্তির স্বাদ পায়নি। পায়নি কোন নাগরিক অধিকার। এই অধিকার-আদায়ে শুরু হয়েছে আমাদের অহিংস আন্দোলন। কত শত সহস্র অনলস কর্মীর প্রয়াসে আমরা এখন কিছুটা দাবী আদায়ে সমর্থ হয়েছি ; কিন্তু সেই সব কর্মীরা অধিকাংশই চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যাবেন—তাঁদের নাম কোনদিনই সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান পাবে না, বর্ষপঞ্জীর 'কে ও কি'র স্তম্ভেও কোনদিন তাঁদের নাম উল্লিখিত হবে না···তবু আমি বিশ্বাস করি এই চলমান সভ্যতার ধারা আগামী দিনগুলিতে আরো উন্নততর হবে, আরো মানবিক হবেন ভাবী বংশধরেরা। তাঁরা সেদিন নিশ্চয় উপলব্ধি করবেন, এই মহত্তর সভ্যতায় সমান অংশ পাবার মূলে আছেন বহু অবজ্ঞাত, বিনম্র ঈশ্বর-পুত্রের জীবন-ব্যাপী সাধনা এবং দুঃখকষ্ট ভোগ !—'

এই হলেন ডঃ মার্টিন লুথার কিং।

কিং যেদিন মারা গেলেন, তার ঠিক পনেরো দিন পরে আণ্ট্লাণ্টা থেকে আমার এক নিগ্রো বন্ধু আলিস একখানা বিচিত্র চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর অংশবিশেষ তুলে ধরলাম :

'···আমি আমাদের মহান নেতার শবানুগমন করেছিলাম। কফিনের আধারে যখন পুষ্পস্তবক নামিয়ে রাখছি, তখন হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমার কোট ধরে টানছে।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, আমার প্রতিবেশী এবং বন্ধু মাইকেল পাইক। পাইকও কিংপন্থী। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, পাইকের চোখে জল নেই, বরং জ্বলছে আগুন। হায়নার মতো হিংস্র।

সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো মেলে পাইক বললে :

…আর কেন ? এবার ফুল ছেড়ে পিস্তলে হাত পাকাও। আমাদের শান্তি আর সদিচ্ছার এই তো পুরস্কার ! এবারে প্রতিশোধের তপ্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়ো, দেখবে অনেক বেশী ফল পাবে।…পাইকের কথা আমারও মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিলো।…হয়তো সেদিন কিংয়ের সমাধির পাশে দাঁড়িয়েই আমরা আমাদের আদর্শকে কবর দিয়ে অন্য মানুষ হয়ে উঠলাম।…'

এভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ তার পাশব সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে চলেছে। ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে। লিংকনের প্রতিমূর্তিখানাতে যেন কারা কালি মাখিয়ে দিয়ে গেছে !

সাদাদের বিরুদ্ধে কালোদের সংগ্রাম ক্রমশই বাঁক নিচ্ছে। অহিংসা থেকে হিংসাতে, আলো থেকে অন্ধকারে। গোটা যুক্তরাষ্ট্রটাই যেন একটা বিরাট জমকালো কফিন ! যে কোন মুহূর্তে মাটি চাপা পড়ার ভয়।…

সোলেমান, গ্রীষ্ম বিদায় নিচ্ছে ধীরে ধীরে। আর দু'একদিনের মধ্যেই শুরু হবে বর্ষার অবগাহন। ভাবছি, সপ্তাহখানেকের জন্য ছুটী নিয়ে বাংলাদেশে যাবো। আমার সেই পেলব জন্মভূমির গ্রামীণ পথে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে দেহটা-মনটা বেশ তাজা হয়ে উঠবে।

কূটনীতির জগতে অতি সম্প্রতি যে আলোড়ন উঠেছে, সে সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আশা করছি তোমার পরের চিঠিতে তুমি রাখবে। আমি সাগ্রহে রইলুম সেই চিঠির প্রত্যাশায়। ইতি—

তোমার

সেনগুপ্ত

প্রিয় সেনগুপ্ত,

তোমার চিঠিটা আমার ড্রয়ারে পুরো একটি দিন পরে ছিল। আমি তো পড়বার এতটুকু ফুরসুৎ পাইনি। কাজের চাপে মাথা তোলা দায়।

আজ, এইক্ষণে পড়ে খুব ভালো লাগলো। অহিংসার দ্বারা অনেক কিছুই করা যায়, কিন্তু অনবরত হিংসার বিরুদ্ধে অহিংস্র মানসিকতাকে বজায় রাখা খুব কম সংগ্রামীর পক্ষেই সম্ভব।

আমাদের দেশের কথাই ধরো না। মরুভূমির বুকে লক্ষ লক্ষ নিরীহ আরবীয় উদ্বাস্তুর উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে ইস্রায়েলী সরকার।

এরই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ঐ সব উদ্বাস্তুরা আজ হয়ে উঠেছে দুর্দ্ধর্ষ গেরিলা। এই গেরিলাদের আক্রমণেই ইস্রায়েল যতটা শায়েস্তা হতে পারে, আরবীয় রাষ্ট্রগুলির দ্বারাও বোধ হয় ততটা সম্ভব নয়।

রক্তে হাত রঞ্জিত রেখে যারা মুখে শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করে, বিশ্বের মেহনতী মানুষরা তাদের স্বরূপ চিনতে আর ভুল করে না। ভাবতে অবাক লাগে, ইস্রায়েলেরপ্রধানমন্ত্রী গোল্ডমেয়র আবার ইদানিং শান্তির আপ্তবাক্য উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন!

গত ১০ই মে ইস্রায়েলের দ্বাবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী খুব আড়ম্বরের সাথে উদ্‌যাপিত হলো। তেল আভিবের বুকে যেন নেমে এসেছিল নাৎসী জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের বৈভব ও দম্ভ।

বিশাল সমরাস্ত্র সম্ভার দেখানো হচ্ছিলো দেশী-বিদেশী সম্মানিতদের। সেদিনের সেই সমাবেশে গোল্ড মেয়ার যে বক্তৃতা দিলেন, তাতেই অনুভব করা যায় মধ্যপ্রাচ্যে আবার প্রচণ্ড এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হবে।

অথবা যুদ্ধ কী শুরু হয়ে যায় নি?

প্রতিদিনের রক্তক্ষয়ী হানাহানি তো লেগেই আছে! আমি তো সমূহ এই বিরোধের কোন মীমাংসা দেখছি না। ক্রমশই শুকনো বারুদ সংগ্রহ করে রাখতে হবে আমাদের।...

১০ই মে গোল্ড মেয়ার বক্তৃতা প্রসঙ্গে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছিলেন। আবার সেই সব জ্ঞানের কথার মাঝে মূঢ় দম্ভও প্রকাশ করেছেন!

আরব দেশগুলির উদ্দেশ্যে শ্রীমতি মেয়ার বলেছেন, আসুন, আমরা শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হই! আরব ও ইস্রায়েলীদের পাশাপাশি বাস করার মত স্থান আছে মধ্যপ্রাচ্যে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই!

এর পরই শ্রীমতি মেয়ার তাঁর সুর পাল্টালেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো রণং দেহী মনোভাব। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করে নেবার মতো সামরিক সক্ষমতা যে ইস্রায়েলের আছে, সেটাই যেন তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

মেয়ার মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্য ইহুদীদের পূর্বপুরুষের রাজ্য। আরবদের উদ্খাৎ করে যতটা স্থান সম্ভব, তারা নিজেদের দখলে রাখবেই।

মেয়ারের এই উক্তিতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছুই নেই। মধ্যপ্রাচ্যের ছাইচাপা আগুন মাঝে মাঝেই দপ্ ক'রে জ্বলে উঠবে! এর প্রচণ্ড দাহিকা শক্তিতে বিশ্বের শান্তি হবে বিপন্ন।

প্রেসিডেন্ট নাসের তাই সেদিন কায়রোতে বলেছিলেন, "মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধ থামবার নয়। শান্তির জল এখানে সিঞ্চিত করবে কে? এ যুদ্ধ একশো বছর ধরেও চলতে পারে!"

সত্যই আমার দেশ এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। নীল নদের বুকের উপর দিয়ে সন্ সন্ বাতাস যেন বারুদের গন্ধ নিয়ে আসে। সিনাইয়ের মরুঝড়ে দেখতে পাই আজাদী

লড়াইয়ের প্রেরণা। লক্ষ লক্ষ আমার তরুণ ভায়েরা হাত তুলে জানাচ্ছে, "জান কবুল, কিন্তু এক ফার্লং জমিও আমরা ইহুদীদের ছাড়ব না!"

রাজনৈতিক সমাধান কী সম্ভব ?

এই মুহূর্তে মনে হয়, না।

অবশ্য বৈঠকের পর বৈঠক বসছে। বর্তমানে চলেছে বৃহৎ চতুঃশক্তির আলোচনা। কিন্তু সবটাই পর্বতের মুষিক প্রসবের সামিল।

সোভিয়েট প্রতিনিধি ডঃ জ্যাকব মালিকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচ্ছন্ন বিষাক্ত ভূমিকায়। তিনি বললেন: "চতুঃশক্তি বৈঠককে বানচাল করে দিল বৃটেন ও আমেরিকা। ১৯৬৭ সালের সীমারেখায় ফিরে না যাবার ইস্রায়েলী গোঁ কে এরাই সমানে মদত দিয়ে চলেছে।"

বন্ধু, একটা কথা তো স্বীকার করবে, ইস্রায়েল যেভাবে আমাদের দেশের এক বিরাট অংশ গ্রাস করে বসে আছে, তা বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘ-বিরোধী। রাষ্ট্রসংঘ তো ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর ইস্রায়েলকে বলেছিল অধিকৃত ভূমি ত্যাগ করে সরে যেতে। কিন্তু গোল্ড মেয়ার তা মানলেন কোথায়? রাষ্ট্রসংঘের কার্যকরী ভূমিকা যে কত জড়, এতেই তা প্রমাণিত হয়।

একজন তরুণ মিশরীয় সৈনিক হিসাবে রক্ত আমার টগবগিয়ে ফুটছে। এক এক সময় মনে হয়, ছুটে যাই সেই সিনাই মরুভূমিতে। সেখান থেকে যাবো লেবানন সীমান্তে। হাত মেলাবো আমাদের গেরিলা ভাইদের সাথে। মরুভূমির সমস্ত তপ্ততাকে উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়বো ইস্রায়েলী হায়নাদের উপর। ওদের শোণিতে প্রতিশোধ নেবো আমাদের লাঞ্ছিত ইজ্জতের, অপমানিত দেশের, অবজ্ঞিত ধর্মের! তারুণ্যের প্রচণ্ড দাহিকা শক্তির কাছে পরাজিত হবে সমস্ত জঙ্গী দাপট!

যুদ্ধ এখনও চলেছে।

প্রতিদিন আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে মধ্যপ্রাচ্য জ্বলছে! বাইরে থেকে সবটা টের পাওয়া যায় না। সুয়েজের তীরে দাঁড়ালে বোঝা যায়, কী নির্মম শক্তিক্ষয়ী বিধ্বংসী যুদ্ধ চলেছে ইস্রায়েল এবং আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে!

বিমান থেকে টনে টনে বোমা ফেলা হচ্ছে, দূরপাল্লার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত শেলগুলি বিকট আর্তনাদে ফেটে পড়ছে। নিয়মিত এবং অনিয়মিত সৈন্যের হানাদারী তৎপরতা লেগেই আছে।

অতি সম্প্রতি ইস্রায়েলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মেয়ে দায়েন এক বিচিত্র প্রচার-অভিযানে নেমেছেন। তাঁর অভিযোগ, সোভিয়েট ইউনিয়ন আরব-ইস্রায়েল সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। সোভিয়েট বৈমানিকরা নাকি মিশরীয় বোমারুগুলিকে চালনা করছে! সোভিয়েট গোলন্দাজরা নাকি ইস্রায়েলী বিমান ভূপতিত করবার জন্য মিসাইল নিক্ষেপ করছে মিশরের মাটি থেকে।

মিথ্যা প্রচার।

সোভিয়েট সরকার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই অপপ্রচারের।

এ কথা সত্য যে, আমাদের দেশ প্রতিরক্ষায় তার অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়ে আসছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সোভিয়েট সৈন্যরা এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে!

আসল কথা, আমাদের সামরিক শক্তি এখন অনেকখানি উন্নত। ইস্রায়েলের কাছে বার বার মার খেতে আর আমরা রাজি নই। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ইজিপ্টের বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'এস-এ-এম ৩' মিসাইল বসেছে। এদের প্রতিআক্রমণ ক্ষমতা অসাধারণ।

অস্বীকার করবো না, সামরিক শক্তিতে ইস্রায়েল এখনো আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী! বিশেষতঃ ইস্রায়েলী বিমান বহর আমাদের

প্রভূত ক্ষতি করতে সক্ষম। এতকাল তো প্রায় অসহায়ের মতো মার খেয়েই এসেছি। ওদের বিমানগুলি আমাদের দেশের অনেক অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, বেপরোয়া বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত করেছে আমাদের অনেক বেসামরিক বস্তু। এমন কি, নীল নদের বাঁধের উপরও ওরা বোমা বর্ষণ করেছে। বহু প্রাণ নষ্ট হয়েছে ওদের সেই অমানুষিক এলোমেলো আক্রমণে।

এমন কি হাঁসপাতাল এবং বিদ্যালয়গুলি পর্য্যন্ত এই বন্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পাই নি। মাত্র কয়েকদিন আগে একটি বিদ্যালয়ের উপর ইস্রায়েলী বোমা ফেলা হয়। প্রায় কুড়িটি শিশু এতে প্রাণ হারায়। ওদের সেই অগ্নিদগ্ধ দেহগুলি নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের বলি।

এ ধরণের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই মিশর আজ নতুন সাজে সাজছে। এরই জন্য সোভিয়েত দেশ থেকে আনা হয়েছে 'এস—এ—এম—৩' ক্ষেপনাস্ত্র যে কোন বিমানকে ভূপতিত করবার এ এক অব্যর্থ অস্ত্র!

সোভিয়েট বৈমানিকরা আমাদের দেশে আসছে ঠিকই। কিন্তু তাদের একমাত্র কাজ হলো, মিশরীয় বৈমানিকদের তালিম দেওয়া।

তবু, আমি স্বীকার করতে বাধ্য ইস্রায়েলের সামরিক শক্তি মিশরের চেয়ে অনেক বেশী। আমরা যখন বিদেশ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র এনে বসাচ্ছি, ইস্রায়েল তখন অনেক দূরপাল্লার জটিল ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীর কাজে প্রায় সফল হয়ে এসেছে!

আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপের মতো ক্ষেপণাস্ত্র ইতিমধ্যেই ইস্রায়েল তৈরী করেছে। ইস্রায়েল আনবিক বোমা প্রস্তুতেও আজ অনেকদূর আগুয়ান। ডিমোনার পরমাণু কেন্দ্রে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে সে উঠে পড়ে লেগেছে।

এই তো অবস্থা !

অতএব ইস্রায়েল যতই শক্তিসাম্যের নামে চিৎকার করুক না কেন, পাল্লা তার দিকেই ঝুঁকে আছে। এটা বাস্তব অবস্থা।

তবে আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর কোন ইস্রায়েলী বিমান বিনা বাধায় বোমাবর্ষণ করে ফিরে যেতে পারবে না।

অবস্থার এই পরিবর্তন ইস্রায়েলের গাত্রদাহের কারণ।

সে তাই তার মুরুব্বী আমেরিকার কাছে আব্দার ধরেছে আরো কার্যকরী অস্ত্র পাবার জন্য। আমেরিকা এবং বহু ইউরোপীয় দেশে ইস্রায়েলের সমর্থকরা রীতিমত আন্দোলনে নেমেছে। ওদের দাবী, ইস্রায়েলকে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে এই অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত জাতিকে।

মার্কিন সাহায্যভাণ্ডার মসে দায়েনের জন্য বরাবরই উন্মুখ। ইতিমধ্যেই প্রেসিডেণ্ট নিক্সন ইস্রায়েলকে প্রচুর বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ট্যাংক সরবরাহ করেছেন। তার ইচ্ছে ছিল, আরো দেড়শ' খানা স্কাইহক ও ফ্যানটম জাতীয় জেট বোমারু ইস্রায়েলকে দেবেন। কিন্তু বাধা এলো মার্কিন সেনেটে। অধিকাংশ সেনেটর বললেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েলী বিমান বহর প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী, এদেরকে আরো মদত দিলে আরব রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

কিন্তু এখন মসে দায়ানের সোভিয়েট ভীতির চিৎকার পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে। নিক্সন শুধু সুযোগ খুঁজছেন কোন অছিলায় ইস্রায়েলকে আরো সমর সম্ভার পাঠানো যায়।

তুমি তো জানো, মার্কিন রাজনীতিতে ইহুদীদের প্রভাব যথেষ্ট। ওদের ভোট শক্তি কম নয়। তাই যে কোন রাজনৈতিক দলকেই তোয়াজ করতে হয় ইহুদী সম্প্রদায়কে। ইস্রায়েলের ডাকে

আমারিকাবাসী ইহুদীরা সংগ্রামে নেমেছে। নিক্সনের মনের উপর তাই আরো চাপ পড়েছে, সেনেট হয়েছে চিন্তিত।

আমেরিকাবাসী ইহুদীদের দাবী অতি বিপজ্জনক! এরা চাইছে ভিয়েতনাম-যুদ্ধের মতো মধ্যপ্রাচ্য-রণাঙ্গনে মার্কিন সৈন্যদেরও ইস্রায়েলের স্বপক্ষে নামিয়ে দেওয়া হোক! নিক্সন হয়তো এতখানি হঠকারিতা করে বসবেন না, বিশেষতঃ কম্বোডিয়া থেকে তিক্ততম শিক্ষা লাভের পর; কিন্তু ইস্রায়েলকে অস্ত্রসরবরাহ যে আবার দ্বিগুর্ণ তেজে শুরু হয়ে যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইস্রায়েলের আসল বিপদ কিন্তু কোন আরবীয় রাষ্ট্র থেকে নয়, বিপদ ওদের আরবীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। গেরিলা তৎপরতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আজ অনেক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র,—মেশিনগান, টমিগান, মর্টার, এমন কি সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রস্তুত 'কাট্যুসা' রকেট পর্যন্ত। কট্যুসা রকেটের মরণ কামড় খেয়ে মসে দায়ানের এখন বেসামাল অবস্থা। আরব গেরিলাদের মধ্যেও তিনি যেন সোভিয়েট ভূত দেখতে পাচ্ছেন।

গেরিলারা আস্তানা গেড়েছে ইস্রায়েল লেবানন সীমান্তে। গত বৎসর আমি মাত্র দু'দিনের জন্য সীমান্তবর্তী লেবাননী শহর কিরিয়াট শিমোনা শহরে গিয়েছিলাম। তখনই পরিচিত হয়েছিলাম একাধিক আরবীয় গেরিলার সাথে। চোখমুখে ওদের ইস্পাত-কাঠিন্য। একটা পোড় খাওয়া জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা পেয়ে শেষে এমন অনমনীয়ই হয়ে ওঠে।

কিরিয়াট শিমোনা শহরেই আলাপ হয়েছিল পঞ্চাশ উত্তীর্ণ মুক্তিযোদ্ধা সুফিউল্লার সাথে। বয়সের বিবর্তনে ওর শরীর প্রায় বাঁকা হয়ে পড়েছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। শুধু প্রতিশোধের দাবাগ্নিতে জ্বলছে ওর মন।

সিনাইয়ে অনেকগুলি খেজুর গাছের মালিক ছিল সুফিউল্লা। সুখী পরিবার,—তিনটি ছেলে এবং দুই বিবি নিয়ে ছাপোষা জীবন। হঠাৎ সেখানে নেমে এলো যুদ্ধের অমোঘ অভিশাপ। '৩২ এর ভয়াবহ মরুঝড়ের চেয়েও বিধ্বংসী সেই জঙ্গী দাপট। ইস্রায়েলী গোলায় সব তচনছ হয়ে গেল। সুফির তিনটি সন্তানের মধ্যে দুটি মারা গেছে, একটিকে ধরে নিয়ে গেছে ইস্রায়েলী হানাদারেরা। দুই বিবি বেপাত্তা।

সুফিউল্লা বেঁচে আছে। যে লোকটা জীবনে পিস্তলে হাত দেয় নি, সে এখন মেশিনগান হাতে বন্য চিতার মতো শত্রু-সন্ধানী। তার বিশ্বাস, তার বড় ছেলে তাগড়াই যোয়ান বেথল এখনও জীবিত,... বন্দী হয়ে আছে ইস্রায়েলীদের হাতে। সন্তানের মুক্তি না পেলে সুফির চোখে ঘুম নেই। অনিদ্রা জর্জরিত দেহে এখন অমানুষিক শক্তি। সে প্রতিশোধ নেবে। নেবেই!

সদ্য খবর পেলাম, সেই কিরিয়াট শিমোনা থেকে আরব গেরিলারা উপর্যুপরি আক্রমণ শানাচ্ছে। ওদের অতর্কিত আক্রমণে ইস্রায়েলের সীমান্ত জুড়ে আজ আগুন জ্বলছে। সেই লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে পড়ছেন এক চক্ষু জঙ্গী-নায়ক মসে দায়ান। সরাসরি হানাদারদের সাক্ষাৎ না পেয়ে তাঁর দাপাদাপি এখন সীমাহীন! সমগ্র ইস্রায়েল সীমান্ত আজ প্রায় জনহীন,—ধূ ধূ করছে!

মসে দায়ানের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ছে লেবাননের উপর। লেবাননের বুক থেকে গেরিলাদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার ইস্রায়েলী সৈন্য সেখানে ঢুকে পড়েছে। দখল করে নিয়েছে কিরিয়াট শিমোনা শহরটি। শত শত ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি বিশাল বিমান বাহিনীর ছত্র ছায়ায় এগিয়ে এসেছে। তারা এগিয়ে গিয়েছিল হারমন্ পার্বত্য অঞ্চল পর্য্যন্ত। আক্রমণ চলেছিল পুরো দু'দিন ধরে।

অথচ, সবটাই কাকস্য পরিবেদনা। পর্বতের মূষিক প্রসব।

কোথায় গেরিলারা ?

রুগ্ন হারমন্ পর্বত, দমকা বাতাস, ধূ ধূ মরুপ্রান্তর,—মুক্তিযোদ্ধারা গেল কোথায় ?

যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে।

এত বড় বিরাট অভিযানে মাত্র ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে, পনের জন ধরা পড়েছে এবং অল্প কিছু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়েছে।

অথচ, মসে দায়ান জানতেন, ঐ লেবাননী পার্বত্য এলাকায় হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। এরা কী ভিয়েতনামী নায়ক গিয়াপের রণকৌশল আয়ত্তে এনে ফেলেছে ? বড় চিন্তার ব্যাপার ইস্রায়েলের কাছে।

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার।

ইস্রায়েলী বাহিনী ফিরে আসার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরব গেরিলারা আবার আক্রমণ চালিয়েছে ইস্রায়েল সীমান্তে। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে শত শত মরিয়া যোদ্ধা।

আমার তাই সমস্ত বিশ্বাস ও স্বপ্ন দানা বেধে আছে ঐ গেরিলাদের সাথেই। ইদানিং প্রায়ই ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে নাম লেখাই মুক্তি-যোদ্ধাদের খাতায়। আমার এত সম্মান, বিলাস, বৈভব, ভালো লাগছে না। রক্তে আমার জেহাদী উত্তাল। ফেরারী সিপাহীর মানসিকতা নিয়ে কূটনীতির জটিল আবর্তনে আর কতদিন থাকা সম্ভব ?

আজ আর লিখবো না। আমার পরের চিঠিতেও এদের কথাই জানাবো। জানিয়ে শান্তি পাই এবং তোমার নৈতিক সমর্থনও প্রার্থনা করি।

ইতি তোমার
সোলেমান ভাইয়া

সোলেমান ভাইয়া,

আমি এখন বাংলাদেশে। ধূসর ও গেরুয়া অঞ্চল ত্যাগ করে এখন যেন সবুজ মখমলের বুকে পা রেখেছি! আমি কিন্তু শহর বাংলার আবর্জনার গন্ধ না শুঁকে গ্রাম বাংলার বাউল মাঠে বুক ভরে দম নিচ্ছি।

আমি এখন আছি বর্ধমানের এক গণ্ডগ্রাম,—তেজগঞ্জে। গ্রামের পাশেই নদী, দামোদর। এককালে ঐ নদী রাক্ষুসে ছিল,—হাজার হাজার মেহনতী কৃষকের সর্বনাশ করেছে। এখন বিজ্ঞান অনেক শক্তিশালী,—দামোদর ধরা দিয়েছে মানুষের কারিগরী নৈপুণ্যে। তোমাদের আসোয়ান বাঁধের সাথে অবশ্য তুলনাই হয় না, কিন্তু আমাদের দামোদর বাঁধ কম কল্যাণকর নয়। নব্বুই লক্ষ একর উষর ভূমিকে সরস করে তুলতে এর অবদান অসামান্য।

প্রায় প্রতিদিনই নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকি। পড়তি বেলার আধো আলো আধো ছায়ায় নিজের সত্তার সাথে অনায়াসে মুখোমুখি হতে পারি। চারপাশে কেউ নেই। শুধু শন শন্ বাতাস বইছে,—কাঁশ বনে লেগেছে হিল্লোল। শিমূল গাছটাকে মনে হবে ভূতুরে। একটা কাঠ ঠোকরা পাখি তখনো সমানে শব্দ করে চলেছে ঠক্-ঠক্ ঠক্…'। শিমুল গাছের পাশে একটা ঝাঁকরা বাবলা গাছ। ঐ গাছটা নাকি অভিশপ্ত,—গত বছর অভাবের তাড়নায় এই গ্রামের এক নব্য দম্পতি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল।

আমার শুনে কষ্ট হয়েছে, কিন্তু ভয় পাই নি। বরং গাছটা আমার কাছে অন্য এক তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। আমার মনে হয়েছে, ঐ গাছটা বর্তমান ভারতবর্ষের অসাম্যকে ধিক্কার দিয়ে চলেছে। এখানে যে অভিশাপ, যে হতাশা, যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি,—তা সবই মুষ্টিমেয়ের চক্রান্তে ঘটে চলেছে। একটি অর্দ্ধ উন্নত দেশে

ধনতন্ত্রবাদ যে কত বীভৎস হতে পারে, ভারতবর্ষ তাঁর নজির।

বেশ রাতে ঘরে ফিরে আসি। ঘরে ঢুকেই দেখতে পাই, মা তার আধময়লা কাপড়খানা পরে তখনো হেঁসেলে রান্নায় বড় ব্যস্ত। রান্নার পর আর একবার স্নান করবেন। তারপর রাত বারোটা পর্যন্ত পাঠ করবেন মহাভারত অথবা, মনসা-মঙ্গল। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মার ঐ একই রূপ দেখে আসছি।···

গ্রাম বাংলায় আস্তানা নিলেও কলকাতায় আমাকে যেতে হয়। দেখা করতে হয় পুরনো বন্ধু বান্ধবের সাথে। তাদের কেউ কেরাণী কেউ প্রফেসর, কেউ বা কৃতি সাহিত্যিক।

কলকাতায় গেলেই একবার অন্তত হাজিরা দেই কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে। সেই গমগমে পরিবেশে আমি যেন যৌবরাজ্যের অভিষেক দেখতে পাই। অনেক মদন কান্তি যুবকের সাথে দেখতে পাই কোন সুবেশা তরুণীকে কথার ফুলঝুরি ওড়াতে। আবার সিরিয়স ছেলেরও প্রচুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তারা রাজনীতি সচেতন, তারা বলিষ্ঠ,—সবল হাতে চূর্ণ করে দিতে চায় এই বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে!

বেশ লাগে।

বেশ লাগে এই কফি হাউস।

এখানেই আলাপ হলো কলেজ ষ্ট্রীটের এক তরুণ প্রকাশক কান্তিবাবুর সাথে। কথায় কথায় তিনি জানতে পারলেন, তোমার—আমার মধ্যে রাজনীতি নির্ভর চিঠিপত্রের আদান প্রদানের কথা। আমাকে চেপে ধরলেন, চিঠিগুলো যেন পর পর সাঁজিয়ে একখানা বইয়ের আকার করে দেই। উনি ছাপবেন। বিশেষ যত্ন নিয়েই ছাপবেন।

অভিনব প্রস্তাব এবং অভিনব পরিকল্পনা! তাই নয় কি ? আমি কিন্তু রাজি হয়ে গেছি। তুমি অমত করো না ···

কফি হাউস কিন্তু ক'লকাতার আসল রূপ নয়। এর আসল রূপ যদি দেখতে চাও তবে চলে এসো ঘিঞ্জী বস্তী অঞ্চলে। দেখবে, মানুষ এখানে প্রাণ রাখতেই কেমন প্রাণান্ত !

দেখে যাও শেয়ালদহ, যাদবপুর, বজবজ, বেলেঘাটা, হালতু··· ইত্যাদির অবস্থা। কলকাতা এখানে বড় নগ্ন। সত্যই ইংরাজ ধর্ষিতা ভরাতমাতার জারজ সন্তান কলকাতা। বিগত যৌবনা দেহ পশারিণীদের মতো থল থলে, গা ঘিন ঘিনে। পচা এঁদো জঞ্জাল, মাছি উড়ছে ভন ভনিয়ে। মানুষে মানুষে একেবারে ঠাসাঠাসি। কুৎসিৎ রোগ, অভাবের বিলাপ, মিথ্যা গোলক ধাঁধায় যুবশক্তির নিদারুণ অপচয়,—বস্তি কলকাতার বীভৎসতা কল্পনাতীত।

তবু ক'লকাতা আমাদের হৃৎপিণ্ড।

ক'লকাতা মরলে বাংলা মরবে।

ক'লকাতা মরলে ভারতের সর্বনাশ হবে।

রাজনীতি-সচেতন কলকাতায় তাই আমাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের ঘন ঘন আগমন-নির্গমন ঘটে থাকে। চরমপন্থী বিপ্লবীরা এ শহরে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, তাতে দিল্লীর টনক নড়তে বাধ্য।

ভারতবর্ষে যারা চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং নির্দেশিত পথে বিপ্লব আনতে চায়, তাদের পরিচিতি একটি মাত্র নামে,—নক্শাল। উত্তর বাংলায় ঐ নামের একটি অঞ্চলে ওদের সংগ্রাম প্রথম দানা বেঁধেছিল। তাই সেই জায়গার নামেই ওদের সামগ্রিক সংগঠনের পরিচিতি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই তরুণের বিদ্রোহ ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। দাবানলের ক্ষিপ্রতায় ওদের এই ব্যাপক বিস্তার সত্যই বিস্ময়কর।

আমি যেদিন ক'লকাতায় ছিলাম, সেদিনই ক'লকাতায় দিল্লী থেকে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসেছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব তিনি,—শ্রী এল, পি, সিং। শ্রী সিং নকশাল দমনের দাওয়াই বাতলাতে এসেছেন!

যথারীতি রাজ্যপাল এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে শ্রী সিং বৈঠকে বসলেন। প্রচুর খানা পিনা হলো। বিগলিত হাসি আর মাপা কথায় বৈঠক শেষও হলো এক সময়।

শ্রী সিং এর ঝুলিতে সেই পুরনো দাওয়াই ঃ—

(১) যখন তখন যাকে তাকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কাল আটকে রাখবার আইনগত উপায় পি. ডি. অ্যাক্ট চালু করতে হবে;

(২) সি, আর, পি, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের সংখ্যা এ রাজ্যে বাড়াতে হবে।

অথচ নকশাল সমস্যা এ ভাবে সমাধান হবার নয়। এ দেশের বিশুদ্ধ সচেতন বিপ্লবী মানসিকতাকে এভাবে জঙ্গী দাপটে দমন করা যাবে না। সম্পূর্ণ রাজনীতিগত ভাবেই তাদের কিছুটা মোকাবিলা করা সম্ভব।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবন কিন্তু সে রকম কথাই বলেছিলেন। কিন্তু কাজে দেখা যাচ্ছে, সেই বাইশ বছরের বস্তা পচা নীতিই তাঁকে পেয়ে বসেছে।

পি, ডি, অ্যাক্টের জালকে তরুণ বিপ্লবীরা ভয় পায় না। ব্যক্তিগত জীবনে আমি ওদের অনেকের সাথেই পরিচিত। ওদের যে নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং বিশ্বাস,—পি, ডি, অ্যাক্টের অক্টোপাশের বাঁধনে তা চূর্ণ হবার নয়।

বরং এতে আশঙ্কা, আছে, বাংলার অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির। তাদের কর্মী এবং সমর্থকদের কপালেই বেশী লাঞ্ছনা জুটবে।

বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বরাবরই একটা বিমাতৃসুলভ মনোভাব রয়েছে। ইদানিং আবার সি, আর, পির কার্যকলাপ সেই মনোভাবকে অনেকটা নগ্ন করে তুলেছে। গ্রাম বাংলা শহর বাংলা এর বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে বিক্ষুব্ধ।

গত বাইশ বছর ধরে এ দেশে যে অসাম্যের ভূতের নাচ চলেছে, তাতে এখন আর তথাকথিত আইন শৃঙ্খলার প্রত্যাশা করা যায় না। জাতীয় আয় বেড়েছে। কিন্তু তা কুক্ষিগত হয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের কাছে। নিরন্ন জাতি ভুগছে নিদারুণ হতাশায়। বেকারিত্বের জ্বালায় যুবসমাজ আজ প্রায় দিশাহারা, বেপরোয়া, শোষণ তন্ত্রের এমন বিস্তার সত্যই অসহনীয়।

আর স্তোকবাক্যের বেশ্যাবৃত্তি এখানে চলবে না। বাইশ বছর ধরে আমরা অনেক গালভরা কথা শুনেছি। আর শুনতে চাই না। তাই ক'লকাতা জ্বলছে। সেই লেলিহান শিখা বিস্তারিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তেও।...

কলকাতায় গিয়ে সদ্য পাকিস্তান থেকে আগত কিছু নতুন উদ্বাস্তু দেখতে পেলাম। আবার পাকিস্তানে শুরু হয়ে গেছে হিন্দু বিতারণ। গত কয়েক মাসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অন্তত চৌত্রিশ হাজার উদ্বাস্তু একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে।

এই এক দৃশ্য!

ঝুটা আজাদীর ফসল এরা। ক্লীব নীতির বলি এরা। যে স্বাধীনতা লাভের পিছনে বলিষ্ঠতার চাইতে তোষণ নীতিই প্রাধান্য পেয়েছিল, সেখানে এমন পরিণতি খুবই স্বাভাবিক।...

পাকিস্তান তার অনেক গুরুতর সমস্যাকে ধামা চাপা দেয় এই সংখ্যালঘু বিতড়ণের জিগির তুলে। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর সেই পূর্বসুরীদের পথই অনুসরণ করে চলেছেন।

এখন দৈনিক গড়ে একহাজার জন ছিন্নমূল নরনারী তাদের সর্বস্ব খুইয়ে আছড়ে পড়ছে ভারতের বুকে। ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকৎ যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আজ তা নিক্ষিপ্ত হয়েছে আস্তাকুঁড়ে।

ভারত সরকার কিন্তু এ বিষয়ে আশ্চর্য নির্বিকার। বাংলার উদ্বাস্তুদের এই সমস্যা কেন, কেন পাকিস্তানের চণ্ডনীতি,—এর প্রতিবাদে নয়াদিল্লী কখনোই তেমন সোচ্চার নয়। এরা কুম্ভকর্ণ। ঘুম আর ভাঙছে না।

সত্যই ভারতবর্ষ আজ এক ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর বিচিত্র সমস্যা। কোনটাই সমূহ সমাধানের নয়। অনেকদিনের অন্যায়, ভুল এবং পাপের এটা অবক্ষয়ী ফলশ্রুতি! আমার পরের চিঠিতে এই সমস্ত সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরবার ইচ্ছে রইলো।

ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

সেনগুপ্ত।

প্রীতি নিবেদন,

সেনগুপ্ত,

একটি বিয়োগান্ত নাটকের বিষাদ-অনুভূতি নিয়ে ধীরে ধীরে বর্ষার পদক্ষেপ ঘটছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এখানকার বর্ষা যে কী চিজ, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। শুধু জল আর জল। ভারী কালো মেঘের আনাগোনা।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মুক্তিকামী সংগ্রামী জনতা কিন্তু সাগ্রহে

প্রতীক্ষা করে থাকে এই বর্ষার। বর্ষা ওদের বড় আয়ুধ, বর্ষা ওদের অপরাজেয় জেনারেল।

রাশিয়ায় যেমন শীত, ইন্দোচীন সমেত সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তেমনি বর্ষাকাল। রুশ শীতের মরণ কামড়ে পালিয়েছিলেন নেপোলিয়ন এবং তাঁর রাজকীয় বাহিনী। এই শীতেরই দাপটে মদগর্বী হের হিটলার বিধ্বস্ত হয়েছিলেন রাশিয়ার মাটিতে।

ইন্দোচীনের অক্লান্ত বর্ষা চরিত্রে ঐ রাশিয়ার শীতেরই সামিল। এই বর্ষায় মার্কিন হানাদাররা দিশাহারা হয়ে পড়ে। জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্টের গেরিলা তৎপরতা শতগুণে বৃদ্ধি পায়। পিচ্ছিল পথ, আরণ্যক রহস্যময়তা, মেকং নদীর উচ্ছ্বাস, সমস্ত কিছু মিলে বিদেশীদের এক মারণ-ফাঁদে যেন ঠেলে দেয়।

এই বর্ষার আতঙ্কেই কি প্রেসিডেণ্ট নিক্সন কম্বোডিয়া থেকে তাঁর সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ভাবছেন? হয়তো তাই। বর্ষাশেষে আবার কোন এক অছিলায় শুরু হয়ে যাবে পেণ্টাগণের নগ্ন, নির্লজ্জ, পাশব আক্রমণ! সেই বোমাবাজি, শিশু-বৃদ্ধ হত্যা, নারী ধর্ষণ, ফসল লুঠ···ইত্যাদি ইত্যাদি।

ম্যানিলার কূটনীতিমহলে এখন প্রধান আলোচ্য বস্তু,—কম্বোডিয়া। যারা ঘোর মার্কিন পন্থী তাঁরাও কিন্তু কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত। কোন প্রশ্নেরই যুক্তিনিষ্ঠ উত্তর নেই। আমতা আমতা করে জেনিভা অথবা জাকার্তার নাম উচ্চারণ করেন।

অথচ, আমরা জানি, শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে জাকার্তায় যা হয়ে গেল তা নিছক পর্বতের মুষিক প্রসবের সামিল। ঢাক ঢোল যথেষ্ট পেটানো হয়েছিল। জেনারেল সুহার্ত স্বপক্ষে কম বিজ্ঞাপন ছাড়েন নি। আমন্ত্রণও করেছিলেন তোমাদের ইণ্ডিয়া সমেত মোট একুশটি দেশকে।

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল একুশটির মধ্যে বারোটি দেশ

সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, চীন, উত্তর কোরিয়া উত্তর ভিয়েতনাম, ব্রহ্মদেশ পত্রপাঠ জানিয়ে দিয়েছেঃ না, এ ধরণের অর্থহীন সম্মেলনে ভিড় বাড়াতে আমরা রাজি নই।

তবু সম্মেলন হলো।

ম্যানিলায় এ নিয়ে কম ঢাক ঢোল পেটানো হলো না। আশ্চর্য্য লাগে মার্কিন কূটনীতিবিদ্‌দের এই নিয়ে অতি তৎপরতা। জাকার্তা-বৈঠক কি নিক্সনের একটি প্রচ্ছন্ন চাল মাত্র ?

সম্মেলনে আকর্ষণীয় কিছুই নেই। গুটি কতক মাথার সেই চর্বিত চর্বনঃ পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র ?

জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রী কিচি আইচি বক্তৃতার ফুলঝুরিতে কম সদিচ্ছা প্রকাশ করেন নি, মায় কমিউনিষ্ট দেশগুলির সাথেও বৈঠকে বসতে চেয়েছেন।

ঐ পর্য্যন্তই।

হোয়াইট হাউসের বরফ এতে গলবে না।

আর হ্যানয়ও ক্ষান্ত দেবে না ও সব আপ্ত বাক্য শুনে।

জাকার্তায় যা সম্ভব ছিল, তাই হয়েছে। মার্কিন ধর্ষণে একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছে।···

ম্যানিলায় এক মহিলা সাংবাদিকের সাথে পরিচয় হলো। নাম তাঁর তিনস্থং। তিন্থু স্থংয়ের বয়স খুব বেশী নয়। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের মধ্যে। কিন্তু এরই মধ্যে যথেষ্ট সম্মান ও প্রসিদ্ধি তিনি পেয়েছেন। ভদ্রমহিলার খুরধার কলম। নিজের কাগজ Focus এ অনেক রথী মহারথীর মণ্ডুপাত করে থাকেন প্রায়ই।

গত বৎসরই এক তীক্ষ্ণ-সরকার- বিরোধী নিবন্ধের জন্য তাঁর দু' শ' পাউণ্ড জরিমানা হয়ে যায়, Focus ও তিন সপ্তাহের জন্য নিষিদ্ধ থাকে।

Focus কার্যালয়টিতে কিন্তু কোন বিলাস বা বৈভবের ছোঁয়াচ নেই। ম্যানিলার এক এঁদো গলিতে একটি নাতিদীর্ঘ প্রেস এবং ঐ প্রেসকে কেন্দ্র করেই সংবাদ পত্রের অফিস।

খান চারেক চেয়ার, রঙ চটা টেবিল, তিনটি বই আর ফাইল ঠাসা আলমারী, দেয়ালে গঁগার ছবি, একপাশে রাখা ফোন,—এই হলো মিস্ তিন্নু সুংয়ের রঙ্গভূমি!

অফিসে যতক্ষণ বসে থাকেন, দারুণ সিরিয়স। কিন্তু সাংবাদিকতার ফাইল হাতে পথে নেমে এলেই একেবারে অন্য চরিত্র। তখন যেন খুব খোলামেলা, সাংবাদিক সুলভ চটুল প্রশ্ন করতেও পিছপা নন। বিশেষতঃ বিদেশীদের সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য খুব। বলেন: Focus গরীব কাগজ বিদেশে সাংবাদিক পুষবার মতো ক্ষমতা তার নেই।··· আপনারাই আমাকে বলুন, আপনাদের দেশের পরিস্থিতি এখন কেমন!

তিন্নু সুং আমাকে ধরে বসলেন, তাঁর কাগজে ইজিপ্ট-ইস্রায়েল সংঘর্ষের একটি বিবরণী লিখে দিতে হবে। স্বনামে এ ধরনের রচনা তো আমি লিখতে পারি না; তাই বেনামীতেই লিখতে হলো।

লেখাটি নিয়ে তিন্নু সুংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম গত শুক্রবার। Focus কার্যালয়ে ঢুকে দেখলাম তিন্নু সুংয়ের সামনে বসে আছেন দীর্ঘদেহী এক যুবক। চেহারায় আমার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

মৃদু স্বরে তিন্নু সুংয়ের সাথে কথা বলছিলেন।

আমি যেতেই উঠে দাঁড়ালেন। কোচকানো চুলে একবার হাত বুলিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। যেন একটা হাল্কা ছায়া আমার গা ঘেঁসে চলে গেল।

তাকিয়ে দেখলাম, তিন্নু সুংয়ের চোখ দুটো সেই মুহূর্তে

কাঁচের মতো চক চকে। হাত দিয়ে চেপে ধরেছেন পেপার ওয়েটটাকে।

"বসুন।"

—আমাকে বসতে বললেন তিমু সুং।

আমি আমার লেখাটা বাড়িয়ে দিলাম: এই আমার লেখা। আরব গেরিলাদেরই উপর লিখেছি। নাম দিয়েছি 'মরু ঝড়'। দেখুন, পছন্দ হয় কি না!

তিমু সুং হাসলেন। বললেন: আমার কাগজের গৌরব, যে আপনার লেখা পেয়েছি! একটু থামলেন তিমু সুং। মাথা নীচু হয়ে এলো তাঁর। মুখ নীচু রেখেই বললেন:

আপনার প্রবন্ধের সাথে আরো একটি আশ্চর্য রচনা ছাপা হবে এই সংখ্যায়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ছোট্ট রহস্যময় দেশ ব্রুনাইয়ের উপর রচিত। কিছুক্ষণ আগে এখানে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁরই রচনা।

আমি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলাম: ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে পারি?

তিমু সুং আর একবার তাঁর কাঁচ চক চকে চোখ দুটো মেলো ধরলেন আমার মুখের উপর। বললেন: ইনি এক আশ্চর্য ব্যক্তি। নাম হাসান আলি। ১৯৬২ তে ব্রুনাইয়ের ব্যর্থ বিপ্লবের এক নায়ক। ঐ বৎসরই তিনি পালিয়ে আসেন এই দেশে। স্বদেশে থাকলে তাঁকে নিশ্চয় প্রাণ হারাতে হতো সুলতানের হাতে।

এক্ষনে আমার মনেও যেন কোন পূতাগ্নি মশাল জ্বলে উঠলো। তার রক্তাভ আলোয় আমি স্পর্শ পেলাম আর এক সংগ্রামী দেশের, আর এক সংগ্রামী জাতির। এই বিরাট পৃথিবীতে বড় বড় দেশের রাজনীতি নিয়েই আমাদের যত মাতোয়ারা। কত ক্ষুদ্র

দেশের জমাট অশ্রু আর সংগ্রামী পটভূমি প্রায়ই আমাদের কাছে অস্বচ্ছ ও অস্ফুক্ত থেকে যায়।

ব্রুনাই এমনি একটি ছোট্ট দেশ।

আমাদের সুয়েজ থেকে তা বেশী দূরে নয়। আবার অত্যাধুনিক শহর কুয়ালালামপুরের প্রায় প্রতিবেশী বলা চলে। তবু আমাদের রাজনীতি সচেতন মনের মনিকোঠায় ব্রুনাইয়ের স্থান কোথায়?

মিস্ তিমু সুংকে ধন্যবাদ, ব্রুনাই সম্পর্কে কিছু ভাববার অবকাশ তিনি আমাকে দিয়েছেন।

এশিয়ার মস্ত মানচিত্রে এই দেশটিকে খুজে নেওয়া কিন্তু বেশ কষ্টকর। কিন্তু একবার সন্ধান পেলে মন আর তাকে ছেড়ে আসতে চাইবে না। ছবির মতো সুন্দর দেশ। নদী-পাহাড়-সবুজ উপত্যকা—তামাম দুনিয়ার সেরা সুন্দর চুমকিগুলো নিয়ে এসে যেন লাগানো হয়েছে এর গায়ে।

সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের দেশ ব্রুনাইকে আর এক নামে ডাকা হয় দারুসালেম। এ নামের অর্থ শান্তি ও সন্তোষের দেশ।

কিন্তু দারুসালেম কি সত্যই শান্তি ও সন্তোষের দেশ?

না, এখানকার গণমানষেও দারুণ বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। যে কোনদিন আগ্নেয়গিরির অগ্নিবমন শুরু হয়ে যেতে পারে। কেঁপে উঠবে এর মাটি, আকাশ-বাতাস। সংগ্রামের লেলিহান শিখা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়বে পূব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। বিপ্লবের সেই তপ্ত হলকায় প্রতিটি মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা সংবদ্ধ হয়ে উঠবে।...

বন্ধু, একটু চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবে, আজকের পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই চরিত্রে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। অথচ এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য চক্রান্ত

চলেছে এই গণতান্ত্রিক চেতনাকে হনন করবার জন্য।

তাই বুঝি ব্রুনাইয়ের গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে এমন নির্মম ভাবে হত্যা করা হলো। সুলতান-শাসিত ব্রুনাই গণতন্ত্রের অনুপযুক্ত ছিল না। কিন্তু জনতার কণ্ঠ চেপে ধরে আছেন এর সুলতান হাসানাল। হাসানালের বয়স খুবই কম। মাত্র তেইশ। স্যাণ্ডহার্ষ্টের ছাত্র। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সম্পূর্ণ নেতিবাচক এবং বৃটিশের পদলেহনকারী। মধ্যযুগীয় আমেজেই তোফা আরামে গা ভাসিয়ে দিতে চান তিনি। শোষণ তন্ত্রের শীর্ষে বসে বৈভবে-অহমিকায় নিজের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর।

বছর দশেক আগে সুলতানেরই উৎসাহে এদেশের সংবিধান রচিত হয়েছিল। সে সংবিধানে গণস্বাধীনতার কোন স্বীকৃতি নেই। কিছু মিথ্যা স্তোকবাক্য আছে মাত্র ঃ যথাসময়ে প্রশাসন বিভাগে জনতার অধিকার নাকি মেনে নেওয়া হবে! ১৯৬৫ সালে একটি তথাকথিত 'বিধান পরিষদ' ও গঠিত হয়েছিল।

কিন্তু এই সেদিন, ১২ই এপ্রিল হঠাৎ সুলতান হাসানাল এক ফতোয়ার জোরে ভেঙ্গে দিলেন বিধান পরিষদ। ঘোষণা করলেন, কোন রকম ভোটাভুটি তাঁর দেশে কোনদিন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না।

এর বদলে সুলতান নিজেরই মনোনীত একুশজন সদস্য নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করলেন। তাঁদের কেউ হলেন তথাকথিত প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, অ্যাটর্নী জেনারেল, অর্থমন্ত্রী ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আর সর্বোপরি রয়েছেন মহাপ্রতাপ তরুণ সুলতান হাসানাল। তাঁর কথাই আইন। তাঁর ক্রোধাগ্নিতে যে কোন সম্মানিত ব্যক্তির প্রাণহানী হতে পারে। সভাসদরা সুলতানের পদচুম্বন করেন, চারণরা তাঁর স্তুতিগান করেন,—পুরোপুরি মধ্যযুগীয় ঠাট-ঠমকে সুলতান একমেবাদ্বিতীয়ম্!

১৯৬৪ সালে ব্রুনাইয়ের রক্ষাকর্তা বৃটিশ সরকার এই দেশে আংশিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার আজ সেই গণতন্ত্রই নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

কেন এমন হলো ?

কুটিল রাজনীতির অন্ধ চৌহদ্দির মধ্যে এর কারণ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। শুধু কতকগুলো বিশেষ কার্যকরণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘোষণার মাত্র দিন ছয়েক আগে ব্রুনাই শহরে হঠাৎ চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সুদৃশ্য তোরণ আর ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে পত পত করে। সুলতান স্বয়ং বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রধানা বিবিকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন সমুদ্রতীরে। প্রতীক্ষা করছেন একটি বিশেষ জাহাজের জন্য। এই জাহাজে করেই আসবেন বৃটিশ রাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড শেপার্ড।

কোন ইংরাজ পুরুষকে দেখলেই আনন্দে, শ্রদ্ধায়, নির্ভরতায় দারুসালেমের সুলতানের চোখ দুটো চক চক করতে থাকে। আর এমন একজন জ্বলজ্যান্ত বৃটিশ মন্ত্রী আসছেন শুনে অস্থির হবেন না ?

অবশেষে তুর্য্যধ্বনি শোনা গেল।

ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে একটি বৃটিশ জাহাজ।...

জাহাজ থেকে নামলেন লর্ড শেপার্ড।

'হাউ ডু ইউ ডু ?'

'সো সো'।

—সুলতানের বিগলিত হাসি।

বৃটিশ মন্ত্রী কিন্তু ব্রুনাইয়ে বেশীক্ষণ ছিলেন না। কিন্তু যতক্ষণ ছিলেন, সুলতান একমুহূর্তের জন্য তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি।

শেষে রাজপুরীতে গিয়ে তাঁরা দরজা বন্ধ করে দিলেন। শুরু হলো এক দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক। রুদ্ধদ্বার বৈঠক।

বৈঠক শেষে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন লর্ড শেপার্ড। সুলতানের উল্লাস আরো বেশী। সামগ্রিকভাবে ইংরাজ জাতির প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।...

শেপার্ড বিদায় নিলেন।...

আর তারপরই সেই ফতোয়ার সহায়তায় বিধান পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন সুলতান। পরিস্কার বুঝতে পারা যায়, এটা ঘটলো বৃটিশ উস্কানিতে। লর্ড শেপার্ডের কুটিল আবির্ভাব এরই পূর্বাভাষ।

গণতন্ত্রের পীঠভূমি ইংল্যাণ্ডের আজ অন্যতম নীতি হলো, পৃথিবীর নবখ্যিত দেশগুলিতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা।

......ব্রুনাইয়ের সুলতান বৃটেনের উপর বরাবরই নির্ভরশীল। কথা আছে, ১৯৭১ সনে বৃটিশ সরকার তাঁর তত্ত্বাবধায়ক দলকে তুলে নিয়ে যাবেন এই দেশ থেকে। কিন্তু সুলতান কিছুতেই তাঁর বৃটিশ প্রভুকে ছেড়ে দিতে রাজি নন। কিছুতেই নয়। বৃটিশ সরকার ও তা চান না, ব্রুনাইয়ে গণশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বৃটিশ স্বার্থ বিন্দুমাত্রও বজায় থাকবে কিনা সন্দেহ।

সুলতানের কমিউনিষ্ট ভীতি দারুণ! জাতীয়তাবাদীদেরও খুব ভয় পান। এদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই বৃটিশ ছত্রছায়ায় চিরদিন থাকতে চান তিনি।

বৃটেন অবশ্য ব্রুনাই ছেড়ে আসতে চাইছে। এত বড় ব্যয়ভার বহন করতে সে আর রাজি নয়।

কিন্তু সুলতান বার বার জানাচ্ছেন, ব্রুনাই স্বাধীনতা চায় না, সে থাকতে চায় বৃটেনের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে।

ব্যাপারটা তাজ্জব, তাই নয় কি?

সাম্রাজ্যবাদীরা স্বেচ্ছায় মুক্তি দিতে চাইছে, আর দেশ সেই

মুক্তি চাইছে না! আসলে একটি মাত্র লোকের ব্যক্তিগত ভোগ, লালসা, প্রতিপত্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি গোটা দেশের স্বার্থ বিসর্জিত হলো। এমন দৃষ্টান্তও আছে এই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে!

১৯৫৯ সাল থেকে ব্রুনাই বৃটিশ স্নেহচ্ছায়ায় আছে। ঐ বছরই ব্রুনাইয়ের নিরাপত্তার নামে এক ব্যাটেলিয়ন গুর্খা সৈন্য পাঠানো হলো ইংল্যাণ্ড থেকে। তারাই ছড়িয়ে আছে এ দেশের প্রতিটি গুরুত্বপুর্ণ স্থানে। এই বাহিনীকে পুষবার যাবতীয় খরচ খরচা সুলতানকেই বহন করতে হয়। খরচ তো কম নয়,—বছরে দশলক্ষ পাউণ্ড!

ব্রুনাইয়ের অন্তর্গত লাবুয়ান দ্বীপে একটি বিমান ঘাঁটিও তৈরী করে নিয়েছে ইংরাজরা। এখানে রয়েল এয়ার ফোর্সের জেটগুলি যখন ওঠে-নামে, সুলতানের প্রীতিমুগ্ধ চোখ দুটি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ঐ ঘাঁটি আর গুর্খারা যদি উঠে যায়, সুলতানের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? সেই অসহায়তার কথা সুলতান ভাবতেই পারেন না।

সুলতানের নিজস্ব বাহিনী বলতে প্রায় কিছুই নেই। মোটে আটশো গার্ড নিয়ে এক রয়াল ব্রুনাই ম্যালে রেজিমেণ্ট গঠন করা হয়েছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বলতে যা আছে, তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কয়েকটি গানবোট, প্যাট্রল বোট আর খান ছয়েক হেলিকাপ্টার,—এই নিয়েই এক তালপাতার সিপাহী বনে আছেন ব্রুনাইয়ের সুলতান।

আজকের পৃথিবীতে ব্রুনাই এক বিচ্ছিন্ন দেশ। অষ্টাদশ শতকের জাপানের মতো ব্রুনাই ও চায় না, বহির্জগতের সাথে যোগাযোগ রাখতে। তার যে টুকু রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ, তার সবটাই গ্রেটব্রিটেনের সাথে। বৃটেনকে বাদ দিলে ব্রুনাই একেবারে

একক, নিঃসঙ্গ। জ্বলন্ত ও জাগ্রত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ব্রুনাই এমন একটি দেশ, যার খবরাখবর আমরা রাখি না এবং রাখবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করি না।

বাইরের কোন দেশ থেকে একটা সামান্য পত্রিকাও এ দেশে প্রবেশ করতে পারে না। বৃটিশ গোয়েন্দায় দেশ একেবারে গিস গিস করছে। জনসাধারণের আনুগত্যে যাতে চিড় না ধরে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাদের! সামান্য সুলতান বিরোধীতাই এখানে গুরুতর অপরাধ, এবং সেই অপরাধীর সমূলে বিনাশ সাধনই ব্রুনাই-সুলতানের নীতি।

বন্ধ্যা রাজনীতির কবলে স্থানুর দেশ ব্রুনাই। তাই এর সুলতান পারছেন এমন ভাবে সাধারণকে প্রবঞ্চিত করতে। যদি কোন শক্তিশালী প্রভাবশীল রাজনৈতিক দলের অবস্থান এ দেশে থাকতো, তবে নিশ্চয় সুলতান এমনভাবে তাঁর মধ্যযুগীয় মেজাজ দেখাতে পারতেন না।

রাজনৈতিক দল অবশ্য এক সময় অনেকগুলিই ব্যাঙের ছাতার মতো মাথা উঁচিয়ে উঠেছিল। কিন্তু পারস্পরিক স্বার্থ দ্বন্দ্বে ওরা কোনদিনই সুলতানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে নি। বরং ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আজ মাত্র একটি দলের অস্তিত্ব আছে।

সুতরাং সুলতান হাসানলের খোয়াব ভাঙ্গবে কেন?

যে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল আজো শিবরাত্রির সলতের মতো টিম টিম করে জ্বলছে, তার নাম পিপলস ইউনাইটেড ফ্রন্ট। এ দলের নেতা জয়নাল আবিদিন কোন দিনই সুলতানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে সাহস পাচ্ছেন না। জনগণের ও তেমন আস্থা নেই তাঁর নপুংশক নীতিতে। তাই সাম্প্রদায়িক জেলা নির্বাচনে পিপলস ইউনাইটেড ফ্রন্ট মোটেই সুবিধে করতে পারেনি। এদেরও ভরাডুবি আসন্ন।

এমন সুখের রাজত্বে "প্রকৃত" দিলদার বনে আছেন সুলতান। ছোট্ট দেশটির তো সম্পদের অভাব নেই! বৈষয়িক স্বচ্ছলতায় তিনি নিশ্চিন্ত।

রক্তের চেয়ে মূল্যবান অঢেল পেট্রোলিয়াম লুকিয়ে আছে ব্রুনাইয়ের কালো মাটির নীচে। বছরে চার কোটি পাউণ্ডেরও বেশী মূল্যের খনিজ তেল রপ্তানী হয় এ দেশ থেকে। প্রতিদিন শত শত ব্যারেল টল টলে তেল পিপা বোঝাই পাড়ি জমাচ্ছে যুক্তরাজ্যের দিকে। দাঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সুলতান তাঁর বিরাট মূল্য অনুভব করতে পারেন। বৃটেনকে বাদ দিলে আমেরিকান আর জাপানীরাও তাঁকে খুব খাতির করে,—সবাই চাইছে এখানে তেলের ব্যবসা ফেঁদে বসতে।

জাপ সরকার প্রায়ই তাঁর কারিগরী উপদেষ্টাদের পাঠান ব্রুনাইয়ে। ওদেরই আনুকুল্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে মুয়রা বন্দর। বিপুল সম্ভাবনা এই বন্দরটির। কাজ শেষ হলেই বহু বিদেশী জাহাজ ভিড়তে পারবে ব্রুনাইয়ের ঘাটে। বহু বিদেশী এর মাটিতে নেমে সবুজ, গৈরিক আর রক্তাভ সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে বলে উঠবে: a mistic land. একটি আশ্চর্য দেশ। দু'হাতে টাকা ওড়াবে বিদেশীরা। হোটেল ব্যবসা ফেঁপে উঠবে ব্রুনাইয়ে। নিত্য নতুন নীলাক্ষির অধরে আবেশ অচেতন তরুণ সুলতান ডুবে যাবেন!···

এমন স্বপ্ন!

এত সম্ভাবনা!

সুলতান তাই কিছুতেই এতটুকু ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি নন।

তবু সেই শান্তি, সন্তোষ এবং সম্ভোগের দেশে ঝড় উঠলো একদিন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ব্রুনাইয়ের তরুণ সমাজ একদিন বিক্ষোভে

ফেটে পড়লো। আগুন জ্বললো স্কুলে-কলেজে, র‍্যালি বসলো সদর রাস্তারই উপর। দেশের এক কোন থেকে অন্য কোন পর্যন্ত সংগ্রাম লেলিহান।

সেটা ১৯৬২ সালের কথা। গণ-বিদ্রোহের নেতৃত্ব দানে এগিয়ে এলেন ব্রুনাইয়ের এক দীপ্ত পুরুষ, এ, এম, আজহারি।

আজহারি একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ব্রুনাই, সারাওয়াক এবং সারাকে নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করবেন। সেই রাষ্ট্রের নাম হবে উত্তর কালিমান্তার। আজহারির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি।

প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ মদতে লক্ষাধিক ম্যালের সেই সংগ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে গেল। নির্মম প্রতিশোধে জনতার রক্তে স্নান করলেন হাসানাল।

কিন্তু অগ্ন্যুৎপাৎ বন্ধ হলেও, আগ্নেয়গিরির গুপ্ত শিখা আজো জ্বলছে ধিক্ ধিক্ করে। যে কোন দিন আবার প্রচণ্ড গণবিদ্রোহে থর থরিয়ে কেপে উঠবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই ছোট্ট দেশটি। হাজার হাজার ম্যাল যুবকের সচেতন পেষণে গুড়িয়ে যাবে মধ্যযুগীয় সুলতানীতন্ত্র।

অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনায় ব্রুনাই ক্রমশই যেন একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

বছর কয়েক আগে ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিষ্ট নিধন যজ্ঞ হয়ে গেল। সেই বিপর্যয়কর দিনগুলিতে শত শত কমিউনিষ্ট চোরাপথে সারাওয়াক এবং ব্রুনাইয়ে প্রবেশ করেছে। ক্রমশই ওরা এক শক্ত ঘাটি গেড়ে বসেছে ব্রুনাইয়ে।

আজাহারির প্রধান সহচর আমেদ জাইদি বিন টুয়াঙ্ক আক্রুস এসে হাত মিলিয়েছেন সেই সব ইন্দোনেশিয় কমিউনিষ্ট-গেরিলাদের সাথে। ইতিমধ্যে প্রচুর চীনাও ঢুকে পড়েছে এই দেশে।

কাজেই রক্তরাঙা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ব্রুনাই আর একটি নতুন জ্বলন্ত ফ্রণ্ট হতে চলেছে। আগুন জ্বলেছে সমগ্র ইন্দোচীনে, সংগ্রামী রেশ রয়েছে কোরিয়ায়, আবার বিদ্রোহের সম্ভবনায় দিন গুনছে ইন্দোনেশিয়া এবং এই ছোট্ট দেশ ব্রুনাই পর্যন্ত বিপ্লব স্নাত হতে চলেছে,—ম্যানিলায় বসে আমরা সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রচণ্ড মুক্তি-সংগ্রামের দ্যুতি যেন দেখতে পাচ্ছি। এর অমোঘ সম্ভাবনাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারুর নেই। থাকা সম্ভবও নয়।

বন্ধু, ম্যানিলায় বসে ভাবছি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মর্মকথা।

কিন্তু আমার সমস্ত মর্মব্যথা জমাট বেধে আছে সেই মরুভূমির রাজ্যে। আমার প্রাণপ্রতিম দেশমাতৃকার চরণে।

আমি সৈনিক!

শত্রুর আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য আমার কাছে অসহনীয়।

তাই ইস্রায়েলী জঙ্গীনেতা মসে দায়েনের প্রতিটি হুঙ্কারে আমার রক্তে যেন আগুন ধরে যায়।

দায়েন ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপে আমাদের তারুণ্যকে অপমান করতে চাইছেন। ইস্রায়েলী সৈন্যের সাফল্যে ডগ্‌মগ্‌ আবেগে তিনি গেয়ে

He who shows thorns
will not hervest grapes—
And he who lights a fire
May be burned.

এই গানটি সুয়েজের তীরে গাওয়া হয়। সুয়েজের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আরবের বীর হৃদয় গেয়ে ওঠে এই গান।

মসে দায়ন সেই গানকেই পছন্দ করেছেন তাঁর জঙ্গী সাফল্যকে প্রকাশ করতে।

দায়েনের এই উল্লাস সাম্প্রতিক। মাত্র কয়েক দিন আগে লেবাননের অনেক অভ্যন্তরে ঢুকে বন্য হানাদারী করে ফিরে এসেছে ইস্রায়েলী বাহিনী। খুশীর মত্ততায় ওরা তাই গা ভাসিয়ে দিয়েছে। মসে দায়েনকে অভিবাদন করছে বার বার। দায়েনের একচক্ষু জ্বলছে, অপর চোখটি অন্ধ। ওঁর জীবন্ত চক্ষুতেই প্রতিহিংসা আর উল্লাস একই সাথে জ্বলছে দপ্ দপ্ করে। সাঙ্গীতিক মুর্চ্ছনায় মেতে উঠলেন :

"He who shows throns

May be butered."

যুদ্ধ অপরিহার্য।

যুদ্ধ করবে ইস্রায়েল যুদ্ধ করবেন নাসের।

প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত করবে আরব গেরিলারা।...

গেরিলারা আশ্রয় নিয়েছে মরু-রাজ্য লেবাননের দুর্গম গিরি-কন্দরে। ওদের সন্ধানে প্রাগৈতিহাসিক বিকট পাখীর মতো লেবাননের আকাশে অহরহ চক্কর খায় ইস্রায়েলী বিমান বহর। চলে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ। ...আগুনের হলকায় দমকা ঝড় ওঠে মরুভূমিতে।... গেরিলারাও ছোড়ে মিসাইল,...এ্যাক এ্যাকের শেলগুলি ছুটে চলে আকাশের বুক চিরে...খণ্ড বিখণ্ড ইস্রায়েলী বিমান আকাশ জুড়ে ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে করতে আছড়ে পড়ে সীমাহীন বালুর রাজত্বে।

এমন কাণ্ড প্রায়ই চলেছে আরব গেরিলাদের আশ্রয়-ভূমি লেবাননে। মাঝে মাঝে ইস্রায়েলী বিমান থেকে হাজার হাজার প্রচার পত্র বিলি করা হয় লেবাননের অভ্যন্তরে। প্রতিটি প্রচার পত্রে মসে দায়েনের সাবধান বানী :

"No Peace-and quiet inside your borders !"

ছত্রী বাহিনীর ছায়ায় ঝড়ের গতিতে লেবাননে বিশাল ইস্রায়েলী সাঁজোয়া বাহিনী ঢুকে পড়েছিল। ঢুকে পড়েছিল প্রায় দশ মাইল পর্যন্ত। প্রায় চল্লিশটি গেরিলা-ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে। গেরিলাদের দশটি সাঁজোয়া গাড়ি তারা খতম করে দিয়েছে।

তারপর মহানন্দে ফিরে এসেছে ইস্রায়েলী সৈন্যরা।··তাবৎ সাফল্যে মসে দায়েন বিজয়ীদের গান গেয়ে শোনালেন।···

এতবড় একটা ইস্রায়েলী আক্রমণ ঘটে গেল।

অথচ, মুক্তিযোদ্ধারা এতে এতটুকুও দমিত হয়েছেন বলে মনে হলো না।···

ইস্রায়েলীরা ফিরে যেতেই আবার শুরু হলো গেরিলাদের আক্রমণ। সেই প্রত্যাঘাতে ইস্রায়েল হতচকিত, বিমূঢ়। জবরদস্ত সামরিক প্রতিভা মসে দায়েনের উদাত্ত গলা থেমে গেল!···

বরং, এই মুহূর্তে বিপ্লবীরাই গেয়ে উঠলো সেই গান :

He who sows thorns
Will not harvest grapes—
And he who lights a fire
May be burned...

বহিঃপৃথিবী ভাবনার বিস্ময়ে ডুবে গেছে : ইহুদি আক্রমণের সময়ে গেরিলারা কোথায় এমন আত্মগোপন করেছিল? কী ভাবে সম্ভব এমন আত্মগোপন?

এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাকে চোখ বন্ধ করতে হয়। মনকে নিয়ে যেতে হয় সেই বিশেষ অকুস্থানে,—সেই মরুরাজ্য লেবাননে।

পাথুরে অধিত্যকা। ধূ ধূ মরুসাগর। শ্যামলতার বিন্দুমাত্রও হাতছানি নেই। সেই ধূসর এলাকায় বিরাট পাহাড়। পাহাড়টিকে ইংরাজরা নাম দিয়েছিল Fatal Land। আরবরা বলে থাকে 'হারমন পাহাড়।

সেই পাহাড়ের কোন এক গুপ্ত ঘাঁটিতে সংঘবদ্ধ হয়ে আছে হাজার তিনেক প্যালেষ্টাইন গেরিলা।

অমেয় মানসিক বলে ওরা মরিয়া বেপরোয়া।

নিজের জঙ্গী দাপটে ইস্রায়েল একাধিক আরবরাষ্ট্রকে বিধ্বস্ত করতে পারবে। কিন্তু পারবে না এই গেরিলাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে। পৃথিবীর কোন শক্তিই গণশক্তিকে পরাভূত করতে পারে না।

হারমন পাহাড়ের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে আদর্শ-স্থানীয় বটে। তিনটি দেশের সীমান্ত জুড়ে দিয়েছে এই পাহাড়,—সিরিয়া, লেবানন এবং ইস্রায়েল।

এই পাহাড় থেকে বন্যার জলের মতো মাঝে মাঝেই উৎসারিত হয় আরব গেরিলারা। ঝাঁপিয়ে পড়ে ইস্রায়েলের সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর। অতর্কিত আক্রমণে সমস্ত কিছু তচনছ করে ফিরে আসে নিরাপদে। গত দেড় মাসে প্রায় ষাটবার এমন আক্রমণ চালানো হয়েছে ইস্রায়েলের উপর।

মসে দায়েন তাই ক্ষিপ্ত।

গোল্ড মেয়ারও ভেবে আকুল।···

আরব গেরিলাদেরই চোরা গোপ্তা, অথচ, অব্যর্থ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত মসে দায়েন কিছুতেই তাঁর অধিকৃত এলাকায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলতে পারছেন না। যখনই তেমন উদ্যোগী হন, তখনই গেরিলাদের আক্রমণে তাঁর সমস্ত প্রয়াস মুছে যায়।

দায়েনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে লেবাননের উপর। ঝিকে মেরে বৌকে শায়েস্তা করবার নীতি নিয়েছেন তিনি। যখনই গেরিলা-দের আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠে, তখনই লেবাননের অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর শুরু হয়ে যায় ইস্রায়েলের বেপরোয়া বোমারু আক্রমণ।

এবারও তেমনি আক্রমণ শানালেন দায়েন সাহেব।

লেবানন রক্ষায় চারিটি আরবীয় দেশ যূথবদ্ধ হয়েছিল। আকাশে

সিরিয়ান বিমানের সাথে ইস্রায়েলী জেটের লড়াই জমেছিল মন্দ নয়, —অবশ্য ইস্রায়েলের তুলনায় সিরিয়ায় বিমান বহর যে কত দুর্বল তাও পরিষ্কার হয়ে গেল। ইরাকী বাহিনীও এগিয়ে এসেছিল ইস্রায়েলী বাহিনীর মোকাবেলা করতে। কিন্তু কার্যতঃ এলোমেলো গোলাবর্ষণ ছাড়া বিশেষ কিছুই তারা করতে পারেনি। জরডনের রাজা হুসেনও তেড়ে ফুরে কিছু সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ওরা প্রায় স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, বিশাল ইস্রায়েলী ট্যাঙ্কবাহিনী কেমন চযে ফেলেছে লেবাননী ভূমিকে। অপ্রতিরোধ্য সে গতি!

প্রেসিডেণ্ট নাসের শুনলেন সব।

কায়রো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলো লেবাননের উপর।

নাসের তাঁর chief of staffকে তলব করলেন। দ্রুত পাঠালেন লেবাননে প্রয়োজনীয় সামরিক উপদেশ সহ।

ঘটনার ঘনঘটায় মনে হলো, মধ্যপ্রাচ্যে বুঝি আবার সেই সর্বগ্রাসী যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। একপক্ষে ইস্রায়েল, অপরপক্ষে আরব রাষ্ট্রগুলির রক্তাক্ত সংগ্রাম বুঝি এবার অনিবার্য!

কিন্তু বাস্তবে তা হলো না।

আসলে ইস্রায়েল বা, আরব রাষ্ট্রগুলি এই মুহূর্তে বড় যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। এখন চলেছে প্রস্তুতি-পর্ব। পরিপূর্ণ প্রস্তুতি শেষ হলেই আবার সর্বশক্তি নিয়ে আসরে নেমে পড়বে তারা।

মসে দায়েনের উদ্দেশ্য ছিল, লেবানন থেকে আরব গেরিলাদের মুছে ফেলা। আর আরব-গেরিলারাও চেয়েছিল, এই সুযোগে তারা নিজেদের শক্তির প্রকৃত পরিচয় পাবে।

লেবাননী বাহিনী কিন্তু মুখোমুখি সংগ্রাম এড়িয়ে গেছে। ইস্রায়েলী বাহিনীকে আক্রমণ করে নিজেদের শক্তিক্ষয় করেনি তারা। শুধু দূরে, দাঁড়িয়ে গোলা দেগেছে ইস্রায়েলী কনভয়গুলির উপর।...

দায়েনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি।

পারেন নি তিনি গেরিলাদের শায়েস্তা করতে। ওদের হেড কোয়ার্টারই খুঁজে পেল না ইস্রায়েলী বাহিনী।

কামান দাগতে দাগতে মসে দায়েনের বাহিনী হারমন পাহাড় পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার ফিরে এসেছে ইস্রায়েলে।

কিন্তু যে মুহূর্তে ইস্রায়েল ফিরে তাকিয়েছে, বন্য চিতার মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো গেরিলা বাহিনী। গেরিলাদের প্রধান নেতা আসির আরাফাৎ ঝড়ের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইস্রায়েলী ঘাঁটিগুলির উপর। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে আসে। উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গেরিলাদের সেই আক্রমণে সমগ্র ইস্রায়েল যেন সবেগে কেঁপে উঠলো। কেঁপে উঠলো মসে দায়েনের বুক। আর আমরা প্রীতিকর উষ্ণতায় অনুভব করতে পারলাম, মুক্তি আর দূরে নয়। মুক্তির পথ এই একটিই !···

হারমন পাহাড়ের গেরিলা যোদ্ধারা এ ভাবেই তুলে ধরলো একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

আজকের চিঠিটা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের প্রসঙ্গ উঠলেই আবেগের রেশ আর টেনে রাখতে পারি না। আমাদের চিঠিগুলি গ্রন্থবদ্ধ হতে চলেছে জেনে খুব খুশী হলাম। তোমার সুখ ও স্বাস্থ্য কামনা করছি।

ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

সোলেমান।

সোলেমান ভাইয়া,

একজন দেশ-প্রেমিকের জ্বলন্ত অনুভূতি তোমার চিঠির প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশ আজ এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। মসে দায়েনের ফ্যাসিষ্ট চরিত্র সত্যই ভীতিপ্রদ! আরবীয়দের সমূলে উৎখাত করতে চান তিনি। তাই তার প্রতিবাদে বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিকামী দেশে লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাতের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অথচ, ইহুদিরা বোধহয় এই পৃথিবীর সবচেয়ে পোড় খাওয়া জাতি। নাৎসী-জার্মানীতে চলেছে তাদের উপর সীমাহীন অত্যাচার। আইক্-ম্যানের অমানুষিক অত্যাচার ভুলবার নয়। গ্যাস চেম্বারে মুহূর্তে দগ্ধ পঞ্চান্ন লক্ষ ইহুদী-আত্মা আজো গুমরে গুমরে মরে। ইহুদিরা অবশ্য সেই অত্যাচারের কিছুটা প্রতিশোধ নিয়েছে আত্মগোপনকারী আইখ্-ম্যানকে আবিষ্কার করে এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে!

ইহুদিদের আজ নিজস্ব দেশ হয়েছে,—ইস্রায়েল।

এটা আনন্দের! একটি যাযাবর জাতি নিজেদের স্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলতে পেরেছে,—ভাবতে সত্যই তৃপ্তি হয়!

কিন্তু ঐ ইহুদিরাই যদি আজ আবার আর একটি জাতিকে ভিটেবাড়ি ছাড়া করে এবং নাৎসী-সুলভ অত্যাচারে মেতে ওঠে, তাহলে আমাদের বেদনা ও বিক্ষোভ স্বাভাবিক। ইস্রায়েল যদি তার জঙ্গী মনোভাব ত্যাগ করতো, তবে এই একটি দেশের প্রতি থাকতো আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি!···

মনে আছে, বছর তিনেক আগে বুদাপেষ্টে গিয়েছিলাম এক নবীন বিজ্ঞান-সভায় প্রতিনিধিত্ব করতে। সেখানে একটি ইহুদি মেয়ে তুরান্য়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল। তুরান্ দর্শনের ছাত্রী। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ সে একটি দূরুহ কাজে ব্রতী হয়েছে। কাজটা হলো, যে সব ইহুদি-পরিবার নাৎসী জার্মানীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তাদের

একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়-তালিকা প্রস্তুত করা। বিরাট কাজ! অজস্র চরিত্রের সমাবেশ।

তুরান আমাকে তাঁর স্টাডিতে নিয়ে পড়ে শুনিয়েছিলো তাঁর লেখা। সমস্তটা আমার মনে ধরে নি। কিন্তু 'আইজন' নামে একটি মহিলার আশ্চর্য জবানবন্দী পড়লাম তুরানের গবেষণায়।

আমি সেই লেখা ডায়েরি-বন্ধ করে নেবার লোভটুকু সম্বরণ করতে পারিনি। আজ এতদিন পরে সেই রজনীর করুণ আত্মস্মৃতি তোমার কাছে লিখে পাঠাচ্ছি। মানবিকতা,—যার কাছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ দাঁড়াতে পারে না, তাই জেগে উঠবে তোমার অন্তরে।

আমি তুরানের লেখার হুবহু প্রতিলিপি পাঠালাম:

[আমি বিলাপ করে চলেছি]

অন্ধকারের আবেশে গুমোট পৃথিবীতে তোমরা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করো: আমি বিলাপ করে চলেছি!

আমি বিলাপ করছি আজ দু' দশকের উপর। কালের স্রোত দূরন্ত উড়ন্ত দাঁড়কাকের অস্থির ঝটপটানির মত বয়ে গেছে। আর আমার অশরীরী আত্মা ভীতা পায়রা শাবকের চেতনা নিয়ে গুমরে গুমরে চলেছে দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে···

মানব, তুমি জন্মেছো বহু লক্ষ বৎসর পূর্বে কোন এক স্মরণীয় মুহূর্তে, আর মানবি, তুমি তোমার কুহেলিকা বিস্তার করতে শুরু করেছো ঠিক জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার পর থেকেই।···

মানব, তুমি এগিয়ে এলে, যৌবনের প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে সেই 'চড়াই' পথটাই বেছে নিলে। এবং তুমি এই মানবী—বড় রক্ত পিপাসু নারী হয়ে হলাহলের পাত্র তুলে ধরেছো। তারপর তোমরা দু'জনে আজ অষ্ট্রেলীয় কাম-ক্ষিপ্ত মাকড়সার মতো বিভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, বিলাপ রত।

আমায় তোমরা কাঁদতে দাও।

আমি দু' দশক ধরে কাঁদছি। কেঁদে চলেছি। এবং আরো কাঁদবো।

দূরে—বহুদূরে—ঐ নভোমণ্ডল! নীচে-নীচে—অনেক নীচে নদী, সাগর, আগ্নেয়গিরি এবং তোমাদের মত অসহায় নির্বিরোধ প্রাণীরা সব চরে বেড়াচ্ছে ইতস্ততঃ।

আমার এই চিৎকার কি তোমরা শুনতে পাবে? আগ্নেয়গিরির লাভার মত আমার ইতিহাস কি দিকে দিকে ধ্বনিত হবে না? শুনবে না দু'দণ্ড আমার বিলাপের ইতিকথা? আমার অন্তর জগতের সমস্ত উচ্ছ্বাস, এই লবণাক্ত আছাড়ি-পিছাড়ি পৌঁছে যাবে না তোমাদের দ্বারে দ্বারে?...

[আমি কে ছিলাম?]

আমি কে ছিলাম?

আমি ছিলাম ভন্ আইজন্।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে অগ্নি-বলয়ের মতো রূপ নিয়ে ফুটন্ত এক যুবতী। রাজহাঁসের মতো সরু গ্রীবা; নীল দীর্ঘায়ত চক্ষু, সোনালী চুলে সামান্য বাতাসেই যেন তুফানের বার্তা, পিনোন্নত বক্ষ, হাত-পা-জানুতে আকর্ষণ আর উপেক্ষার স্পর্ধিত প্রকাশ।

সেই আমি ভন্ আইজন্ জন্মেছিলাম বুদাপেষ্টের এক সামান্য কেরাণী-সংসারে।

বাবার পয়সায় বুঝলাম, আমার তৃপ্তি হবে না। ঐ নোংরা একপাল ভাই বোন নিয়ে আমার ফুটন্ত যৌবনকে নিষ্পেষণ করতে পারবো না। একদিন বুদাপেষ্টের কর্ম চঞ্চল পথের ধারে বসে বসে ভেবে চলেছি। সামনেই কাফে-হাউসে ভিড়। পিছনে সস্তা বারে

কান্না যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে। তুষার পাতের মতো হিম মৃত সেই সুর। রিডে রিডে বন্দীর আর্তনাদ যেন।

পা দুটো যেন দুমড়ে আসছিল।

কাফে-হাউসের আয়নায় নিজের মুখ দেখে চমকে উঠলাম: ঈশ্বর, আমি তো সুন্দরী! আমার এই ধবে ধবে রঙে গোলাপী আভা, পাতলা ঠোঁট দুটো ঈষৎ কম্পমান, বুক এবং গ্রীবা—এ বয়সী মেয়ের ঈর্ষার বস্তু; আমি তো শিল্পীর কল্পনার খোরাক!

ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ চেতনায় ভরপুর আমি কাফে হাউসের একটি নির্জন কেবিনে যেন আত্মগোপন করলাম। এক কোনায় টাঙ্গানো পর্দাটাকে একরাশ বিরক্তিতে সরিয়ে বসে পড়লাম। কফিতে চুমুক দিলাম। বিস্বাদ, বড় তিতো। চোখ দুটো বুজে এলো।··· হঠাৎ—

হঠাৎ কে যেন আমায় আলতোভাবে স্পর্শ করলো।

কে? কে?

একজন পৌঢ়। আমায় আহ্বান জানাচ্ছেন।—

কে এই পৌঢ় তোমরা জানো?

ইনিই বুদাপেষ্টের প্রখ্যাত ধনী জার্মান এঞ্জেল ধীষ্টন। নর্কিড রক্তের বুনিয়াদে ডগ্‌মগে লোক। শহরের এক কোনে তাঁর প্যালেস। সদ্য তাঁর চতুর্থ স্ত্রীকে ডিভোর্স করে এসেছেন।

পক্ককেশ ভদ্রলোককেও বড় ক্লান্ত, বিষণ্ণ বলে মনে হলো। দু'পলক তাকিয়ে থেকে যেন খুব সুন্দর বলেও মনে হলো। বোধহয়, এই বয়সই মানুষকে তার রূপ প্রাচুর্যের সর্বোত্তম খনিতে পৌঁছে দেয়।···

আমি ধরা দিলাম!

পাইন আর ওক গাছগুলো ফিস্‌ফাস্‌ করলো। হাঙ্গেরীর বিখ্যাত

তৃণভূমি, আর্যদের আদি-ভূমি, বাতাসের তালে তালে নর্তন করে চললো। নর্কিড রক্তের চেতনায় আমার নীল চক্ষুর উপর কে যেন চুম্বন আঁকতে থাকে বারে বারে।...

[এঞ্জেল ধীষ্টনের ধৃষ্টতা।]

মোহ! বুঝলে হে নীচের জগতের প্রাণীরা, সবই মোহ!

নতুবা, এঞ্জেল ধীষ্টনের এই ধৃষ্টতা হবে কেন? স্পর্ধিত চেতনায় কম্পিত আঙ্গুল নিয়ে আমায় ছুঁতে চাইছিল থেকে থেকে।

আমি সভয়ে দেখছিলাম, ওর হাতের রগগুলো বড় ভয়ানক ভাবে প্রকটিত, চামড়া যেন সিগারেটের কাগজের মতো মুড়ে মুড়ে এসেছে; নুয়ে আসা মুখখানা দেখে সমস্ত শরীর আমার ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠলো।

কী বিশ্রী, কুশ্রী, ভয়ানক।

পঞ্চাশের উপর যার বয়স; তার আবেগের সে কী আকুলি বিকুলি! অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিলো। ইচ্ছে হচ্ছিলো, বুড়োর গলা টিপে ধরতে। গলার প্রতিটি শিরা উপশিরা ওঁর কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে,—সমস্ত মুখময় বলিরেখার আঁচড়।

আমার স্কার্ট ধরে টান লাগাতেই ফিনকি দেওয়া রক্তের মতো ছিটকে সরে এলাম।... আমার রাতগুলো ব্যর্থতায় ও রিক্ততায় হাহাকার ক'রে চললো সমানে।

এই বিরাট বাড়ীটার প্রসারিত লনের যে কোন একদিকে বসলেই দূরের ঐ পাহাড়টাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে ঘোড়ার পিঠে শস্যের বোঝা নিয়ে কৃষকদের দল

গান গাইতে গাইতে শেষ বিন্দুটির মতো বহুদূরে মিলিয়ে যায় প্রত্যহ। মিলিয়ে যায় অগুণিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতীর দল। ওদের প্রাণ-চঞ্চলতায় পথের ধূলো যেন আবির হয়ে পরিবেশকে রাঙা করে তোলে ক্ষণিকের জন্য।

একদিন হঠাৎ নজরে পড়লো একটি ফুট ফুটে ইহুদি মেয়ে জোয়ান এক জার্মান যুবকের হাত ধরে হাসতে হাসতে পাহাড়ী ঝোঁপটার আড়ালে হারিয়ে গেল।

একটা অনার্য ইহুদি মেয়ের সুখ দেখে আমার সর্বশরীর জ্বলে উঠলো। খ্রীষ্টনের আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া বের করে ছুট দিলাম সেই ঝোঁপটার কাছে।...

কিন্তু ফিরে যখন এলাম, আমি তখন বড় অবসন্ন।

আমি দেখে এলাম ওদের জগতের সেই দৃশ্য :

ঝোঁপের অন্তরালে ইহুদী মেয়ে দু'হাতে চেপে ধরেছে জার্মান যুবকের মুখ আর ঘাড়কে। মাটির সাথে সমান্তরাল হয়ে এসেছে তারা!...

সেই রাতেই আবার এলো এঞ্জেল খ্রীষ্টন।

আবার সেই অত্যাচারের নিরর্থক ভূমিকা।... শেষে যখন ও ক্লান্ত হয়ে ঘুমের ওষুধের দিকে হাত বাড়ালো, তখনই সেই সর্বনাশটি আমি ক'রে বসলাম।

তোমরা বিশ্বাস করো, আমি তখন এ জগতের প্রাণী ছিলাম না। আমি তখন পশু, খুনী! ...

পরদিন ভোর হলো।

লোকেরা ভিড় জমালো। আমি প্রাণ ভরে কাঁদলাম। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠলাম। অত্যধিক ঘুমের ওষুধ খেয়ে এঞ্জেল খ্রীষ্টন মারা গেছেন।

প্রজারা এলো। কালো পোষাকে ঢাকা বৃদ্ধ পাদ্রী এলেন। ওল্ড

টেস্টামেন্টের গুরুগম্ভীর আবৃত্তি বাতাসের হাত ধরে ধরে আবর্তিত হতে থাকে যেন আমারই চারধারে।

মৃতের মুখের উপর থেকে চাদরখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলা হেলা। সাথে সাথে ভূত দেখার মতো আমি চমকে উঠলাম। এ যেন এক প্রিয়দর্শন যুবক! এঞ্জেল খ্রীষ্টন মৃত্যু-আলিঙ্গনে এত সুন্দর হয়ে গেল কী করে? এ যেন সেই যুবক, যাকে আাকড়ে জমির সাথে নিশে যেতে চেয়েছিল ইহুদি মেয়েটি!

আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো নুয়ে এলাম। কাম্পিত ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করলাম মৃতের হিম শীতল ললাট।

[কবরের কান্না]

তারপর কেটে গেলো আরও দুটো বছর!

এঞ্জেল খ্রীষ্টনের অপরিমেয় ধন সম্পত্তির অধিকারী এখন আমি। কিন্তু মনে শান্তি নেই। নেই আর সেই পুরাতন রূপচর্চা।

প্রতি রবিবার ব্যারিয়েল গ্রাউণ্ডে যাই। খ্রীষ্টনের কবরে ফুল ছড়াই। তারপর আড়ালে, একান্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলি। কান পেতে শুনতে পাই, বাতাসেও কার যেন কান্না ভেসে আসছে। কবরের কান্না!

[সুন্দর যুবক আইখ্‌ম্যান এলো!]

পৃথিবীর হাহাশ্বাস শুনেছিল সে-যুগের মানুষরা। তাদের অনেকেই এখনো তোমাদের মাঝে ছড়িয়ে আছে। অ্যাডলফ্‌ হিটলার যুদ্ধের বিষাক্ত বাণ ছুড়লেন। ইউরোপের লক্ষ লক্ষ বিহঙ্গ শরাহত

হয়ে ছটফট করতে করতে লুটিয়ে পড়ছে। তাজারক্তে রক্তিম হয়ে উঠলো চারিদিক।

—"এস, এস."

—"এস, এ."

বিখ্যাত অথবা, কুখ্যাত 'এস, এস' এবং 'এস, এ' এসে গেল জার্মান-অধিকৃত বুদাপেষ্টেও। নর্কিড রক্তের সম্মানীতা মহিলা আমি। আমার প্রতিপত্তি কত! 'এস. এস.'-এর ছেলে-মেয়েরাও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকায় ভন আইজন ধীষ্টনের প্রাসাদের দিকে!

আমি ঘোড়ায় চেপে মধ্যে মধ্যে বেড়িয়ে আসি। সেই পাহাড়ী পথ ধরে বহুদূর এগিয়ে যাই।...

কিন্তু হঠাৎ একদিন বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াই।

দেখতে পাই, হাজার হাজার 'এস. এস' সৈনিক যেন ঠিক হিটলারী ভঙ্গিতেই ষ্টেনগান, টমিগান আর মর্টার নিয়ে ঘিরে আছে বিরাট প্রান্তরটিকে। মাঠের মধ্যে কিসের যেন কল বসেছে। মোটা মোটা চিমনি দিয়ে গল্ গল্ ক'রে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সাদা আর কালো ধোঁয়ার সংমিশ্রণ। একটা উৎকট গন্ধে বাতাস এখানে ভারী।

বিস্ময়ে ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম।

স্থানীয় একটি 'এস. এ' মার্কা জার্মান মেয়েকে জিজ্ঞাসা করাতে সে জানালো, ওখানে নাকি লক্ষাধিক ইহুদি নর-নারীর জন্য নতুন এক বসতি স্থাপন করা হচ্ছে, ওরা ঐ সব কলে কাজ করবে, দেশের সমৃদ্ধি বাড়াবে।

—"ইহুদি!"

কেমন যেন আহত হলাম। অনার্য ইহুদিদের জন্য এত ব্যবস্থা!

—"কিন্তু ব্যবস্থাপক কে এখানে?"

—"আইখ্ম্যান"—দৃপ্তস্বরে জবাব এলো।

'আইখ্‌ম্যান !'

সেই একটি ধ্বনি অনুরণিত হতে থাকে বার বার।

রাতে শুয়েও নামটি কয়েকবার উচ্চারণ করলাম।...

কী আশ্চর্য ভাগ্য আমার।

সেই আইখ্‌ম্যানই এসে হাজির হলেন তার পরদিন। আমারই ব্যড়ীতে।

কনভয়ে চেপে ধূলো উড়িয়ে নামলেন আমার দরজায়। তখন পড়ন্ত বেলা। ঢলে পড়া সূর্যের ম্লান উত্তাপ এসে স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে তাঁর মদন-কান্তি চোখ মুখের উপর।

পঞ্চশরে দগ্ধ আমি সতৃষ্ণভাবে তাঁর রূপ পান করলাম।

উচ্ছল যৌবনকে বলদর্পী তেজে বেঁধে ফেলেছেন আইখ্‌ম্যান। এ গ্রেট ইয়ং ম্যান অফ্‌ জার্মানী !

আমি সাদরে আহ্বান জানালাম !...

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত মৃত ধাষ্টনের কক্ষে আলো জ্বলছিল। নীল আলো। তারই স্বপ্নমধুর পরিবেশে আইখ্‌ম্যান আমায় স্পর্শ করলো, আলিঙ্গন করলো, চুম্বন আঁকলো...

তারপর...

তারপর দুটো শূন্য বোতল দু'ধারে ছিটকে পড়লো।...

[নরক]

– ওখানে কি হয় গো ?'

—'কোথায় ? '

—'ঐ যে ধোঁয়া উড়ছে।'

—'ইহুদিরা কাজ করছে।'

'—আমি ওখানে যাবো। নিয়ে যাবে আমাকে ?'

—'না।'

কঠিন সুরে আইখ্‌ম্যান আমাকে থামিয়ে দিল।

অথচ, চোখের সামনে দেখছি, রোজ রোজ শত শত ঢাকনা দেওয়া গাড়িতে হাজার ইহুদীদের আমদানী করা হচ্ছে ওখানে। এত ইহুদিদের স্থান হচ্ছে কীভাবে ঐ স্বল্প পরিসরে ?

হঠাৎ সেদিন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।

বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ফুরফুরে মিষ্টি বাতাস। আজ সন্ধ্যায় আইখ্‌ম্যানের আসবার কথা আছে। সমস্ত দেহে সুগন্ধি বস্তু মেখেছি। এখন ফুলের সু-বাসে আবেশ আনবার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ 'ঘর-ঘর-ঘর…' শব্দে চমক ভাঙ্গলো।

একটা লোহার পাত দিয়ে ঘেরা গাড়ী তীরগতিতে ছুটে যাচ্ছে সেই ইহুদিদের আস্তানায়। চকিতে দেখতে পেলাম, সেই গাড়ীর অন্তরালে কয়েক ডজন উলঙ্গ নর নারী। লজ্জায় প্রত্যেকেই চোখ ঢেকে রয়েছে হাত দিয়ে।

কি আশ্চর্য। কি লজ্জা। এ কি প্রহেলিকা।…

আইখ্‌ম্যান এলো। মদের ঘোরে ঢুলতে ঢুলতে এলো।

আমি ওকে শয্যায় তুলে নিলাম।…

অনেকক্ষর পর।—

'বলো না, ওদের ওভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কি জন্য ?'

'ওরা স্নান করবে, শুদ্ধ হবে।'

'মিথ্যে কথা। তুমি লুকোছো'।

আইখ্‌ম্যান শক্ত হয়ে এলো। অনেকক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলো সেই ভয়ানক শব্দটি : 'ওদের দেহ ধোয়ার আকারে মিশিয়ে দেওয়া হবে ঐ আকাশে।'…

'...এই হাজার-হাজার।...'

আমার আর্তনাদ আছড়ে পড়লো।

–হাজার কি, লক্ষ লক্ষ–পঞ্চাশ লক্ষ এরই মধ্যে খতম।

অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো আইখ্‌ম্যান। দু'হাতে যেন শূন্যে তুলে নিল আমার পাখীর মতো ভীরু দেহটিকে। তারপর আবার আঁকড়ে ধরলো। আমার মনে হলো, কারা যেন তোপ দাগছে আমার কানের কাছে। পম্পাই নগরীর শেষ দিনটির অনুভূতি নিয়ে আমি কাঁপছি আর কাঁপছি।

ঐ গ্যাস-চেম্বার।

ওর চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়া বের হয়, তা কোন সৃষ্টির নয়। ও ধোয়া নরকের। লক্ষ লক্ষ নগ্ন ইহুদি নর নারীকে ধরে আনা হয়েছে ওখানে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—অসহায় চোখ দুটো তুলে হয়তো ওরা প্রশ্ন করে।

'আর এক সুন্দর দেশে। এক নতুন শিল্প-নগরী তৈরী হচ্ছে। সেখানে তোমরা কাজ করবে, নিজেদের হাতেই গড়ে তুলবে নতুন উপনিবেশ।'

নগ্ন যুবক-যুবতী চোখ ঢেকে লজ্জা তাড়াচ্ছে। হঠাৎ গাড়ী থামতেই দেখছে, সত্যই তাদের সামনে এক বিরাট শিল্পাঞ্চল।

'এস এস' কর্মীরা জানালো, এখানে অনেকগুলি স্নানাগার আছে পর পর। তোমরা স্নান করে নাও। তবে সঙ্গে যে সব গহনা বা টাকাকড়ি আছে, সমস্ত জমা রেখে রসিদ নিয়ে নিও। ফিরবার সময় ফেরৎ পাবে।

নগ্ন মিছিল ধীরে ধীরে তাদের স্নানাগারের দিকে এগিয়ে চলেছে।... তারা দরজায় হাত দিয়েছে। দরজা খুলে গেল। বাঃ! সুন্দর স্নানাগার তো! কল, গামছা, সাবান, প্রসাধনী সামগ্রী,—সমস্ত সাজানো রয়েছে থরে থরে।

হঠাৎ দরজাটা পিছন থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

তারা সচকিত হয়ে ঘুরে তাকালো। সাথে সাথে সভয়ে দেখতে পেলো, স্নানাগারের দেয়ালগুলো থেকে সাদা ধোঁয়াটে গ্যাস নির্গত হচ্ছে। দেখতে দেখতে সেই গ্যাসে ভরে গেলো কক্ষগুলি। হাজার হাজার অসহায় নর-নারী ছুটোছুটি শুরু করলো সমস্ত ঘরময়। পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইলো। প্রাণপণে চিৎকার করে বাইরের আকাশ-বাতাসকে ভরিয়ে তুলতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। অসহ্য জ্বালায় ছটফট করতে করতে এক সময় নিজেরাই গ্যাস হয়ে গেল।

এবং সেই সাদা ও কালো ধোঁয়া গল্ গল্ করে চিমনির মুখ থেকে নির্গত হতে থাকলো সমানে। উৎকট গন্ধে বিরক্ত হয়ে সাধারণ লোক জিজ্ঞাসা করছে ঃ ওখানে কী হচ্ছে ও-সব ?

[আমি বিলাপ শুরু করে দিলাম]

অন্ধকারের আবেশে গুমোট পৃথিবীতে তোমরা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করো—আমি বিলাপ করে চলেছি !

বিলাপ শুরু করেছিলাম সেই রাত থেকেই। সেই রাতেই আমি পালালাম। শুধু আমি নয়। পালাচ্ছে বহু 'এস, এস,' স্বেচ্ছাসেবকও। ওদের দিন নাকি ঘনিয়ে আসছে ! রাশিয়ার 'লালফৌজ' তার কঠিন আবেষ্টনীতে চুরমার করে দিচ্ছে বলদর্পী হিটলারের শেষ আবেগটুকুও !

আইখ্ম্যান তুমি নিপাত যাও !

সাম্প্রদায়িক বহ্নি তুমি নিভে যাও চিরতরে !

বুদাপেষ্ট নাৎসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও !

জার্মান নারী হয়েও আমি উন্মাদিনীর মতো স্খলিত বসনে ছুটে পালাচ্ছি একপাল বন্ধনমুক্ত ইহুদি মেয়েরই সাথে। আমি ওদের সাথে এক হয়ে গেছি। একাত্ম হয়ে গেছি ! ছুটতে ছুটতে মনে হলো—আমি যেন সেই ইহুদি মেয়েটি, যে একবার এক জার্মান প্রেমিকের গলা

আর ঘাড় ধরে মাটির সাথে মিশে যেতে চেয়েছিল। আমি যেন সেই মেয়েটি !"

বন্ধু, আইখ্‌ম্যানের এক নর্মসহচরী আইজনের লেখাতেই কী ফুটে উঠছে না কী বীভৎস অত্যাচার চলেছে এই ইহুদিদের উপর। এক-আধ মাস নয়! শতাব্দীর পর শতাব্দী! সেই যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করবার পর থেকেই লেগে আছে এই অভিশাপ!

তাই আজ পায়ের নীচে শক্ত মাটি পেয়ে ইহুদিরাও যদি অমন অত্যাচারি হয়ে ওঠে, তবে বুকে বড় লাগে!

মানুষ কবে তার এই জঙ্গী চেতনাকে মুক্তি দেবে? কবে? কবে অবসিত হবে এই ঘৃন্য কামনা? অলস সময় ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। বিষণ্ণ হৃদয়ে শুধু জমছে রাশি রাশি দুঃখ ও অসুখী দীর্ঘশ্বাস। স্বপ্নবিলাসের নীরব উপেক্ষা অসহনীয়। দুটি একটি জীবন্ত ক্ষণ আসে, কিন্তু ধরে রাখতে পারি না। অনেক হতাশার আলোর সন্ধানে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠি, আপন মনে বলি—'আলো! স্বাগত আলো!'...

আকাশে মেঘের আনাগোনা। অথচ বৃষ্টি নেই। বৈশাখ পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠ এলো। এরপর আষাঢ় সমাগত। এখনও যদি বর্ষা না আসে, ভয়ের কারণ। খরাপীড়িত দেশের দুর্দ্দশা অকল্পনীয়। এ দেশে মাঝে মাঝেই বন্যা অথবা খরার মুখোমুখি হই আমরা। প্রকৃতির দান-উপাদানের উপর আমাদের নির্ভরতা এতটুকু কমে নি।

বেশ কিছুদিনের ছুটির অবকাশে বাংলা-বিহার সীমান্তে ম্যাসেঞ্জর ড্যামে একদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলম। সঙ্গে দু'জন বাল্যবন্ধু। আবদ্ধ জলের সামনে দাঁড়িয়ে ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ যেন ঝিঁঝির কান্না শুনতে পেয়েছি। জীবন অনুসন্ধিৎসায় আমরা তিন বন্ধুই নীরব। বন্ধুবর বিমলের মুখখানা থমথমে, ওর অফিসের বড় সাহেব প্রচুর 'তেল' খাওয়া সত্ত্বেও বিমলের বিরুদ্ধে 'মেমো' ইস্যু করেছেন, সার্ভিস

রেকর্ডে পড়েছে লাল কালির আঁচড়।

আর এক বন্ধু দীনবন্ধু গড়াই বড় চিন্তিত, তাঁরই এক ছাত্র পরীক্ষার হলে কড়া হওয়ায় ছুরি মারবে বলে ভয় দেখিয়েছে। দীনবন্ধু তাই বেড়াতে এসেও সন্ত্রস্ত,—সামান্য পাতা ঝরার শব্দেও চমকে চমকে ওঠে।...

শুধু বাংলা দেশ কেন, ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে ছাত্র বিক্ষোভ। তারুণ্যের প্রতিবাদ! নকশাল আন্দোলনের নেতৃত্ব এই সম্প্রদায়ের হাতেই এসেছে। আমি এক শিল্পীকে জানি, যে ছবির মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের প্রচারে নেমেছেন। শিল্পীর নাম ধাম জানাতে বাধা আছে। বর্ধমানের এক এঁদো গলিতে তাঁর ষ্টুডিও। রাস্তাটা অতি পুরনো,—হু' ধারে নোনা ধরা বাড়ি। দোতলায় তাঁর সাধনার স্থান। অনেকগুলো পুরাকালীয় জিনিস সেখানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। দেয়ালে ক্যানভাসে অসমাপ্ত সমস্ত প্রাইমারী শ্যাডো। শিল্পী কাজ করেন, কিন্তু চারদিকটা একেবারে নিশ্চুপ, থমথমে, আর কিছুটা যেন গুমোট। ওঁর গায়ে তালিমারা জামা, চুলগুলো ঝড়ে ওড়া কুটোর মতো, নাকটা খুব উঁচু, আর চোখগুলো দেখলেই বোঝা যায়, লোকটার চরিত্রে অন্তত নিষ্ঠা আছে।

আমাকে প্রথমে শিল্পীবন্ধু সহৃদয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, "তুমি আবার এই গরীবের ঘরে কেন? ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে যে!"

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

ছোটবেলা থেকেই ক্যারিয়ার গঠনের উদগ্র বাসনা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এখন আমার চরিত্রের পরিবর্তনটুকু সহজে পরিচিতরা মেনে নিতে পারে না।

ভারতের ইতিহাস এক যুগ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। যুক্তফ্রণ্টের পতনের পর দেখছি, রীতিমত ফ্যাসিষ্ট চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

যাকে তাকে খুন-খারাপির দায়ে গ্রেপ্তার হতে দেখছি। আসল খুনী হয়তো বেপাত্তা। যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার জনগণের আসা-ভরসা ও সংগ্রামকে সংগঠিত হতে দেখেছিলাম নির্বাচনের ঠিক পরই। মনে আছে, লক্ষ লক্ষ জনতা সেদিন উল্লাসে পথে নেমে এসেছিল। লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠছিল, নামছিল।···আজ সেই চেতনা, প্রত্যাশা চুড়ান্ত মার খেয়েছে। গণইচ্ছাকে বলি দিয়ে পপুলার ফ্রন্টের পতন ঘটালো এর বিচ্ছিন্ন শরিকরাই।

রাজনীতি সচেতন মানুষের চোখের সামনে ঝুপ করে নেমে এলো বিভীষিকাময় অন্ধকার। কেন্দ্র তার দঙ্গল দঙ্গল পুলিশ পাঠিয়েছে পশ্চিম বাংলাকে ঠাণ্ডা করতে। মোচ চুমড়ে তাদের সদম্ভ পেষণ চলেছে। জনতার লবনাক্ত অভিমান তাই সীমাহীন।

এদেশের ভাগ্য, অর্থনীতি এবং কিছুটা রাজনীতিও এখনো নির্ভর করছে মাত্র কয়েকটি লোকের ইচ্ছার উপর। এরাই জাতীয় আয়ের বহরটুকু চেটেপুটে খায়, আর কাগজে-কলমে 'উন্নতি'র জয়ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়। কিছু বোদ্ধা লোক আছেন, যারা এই মুহূর্তে খুব নিস্পৃহ। দেখে মনে হয়, জ্ঞানীরা নির্বোধ হয়ে উঠেছে। একমুখ দাড়ি আর লম্বা জুলপি নিয়ে মার্কস আলোচনা করেছে, এ ধরণের উঠতি যুবকের সংখ্যা কম নয়! কিন্তু বস্তুবাদ নিয়ে ওদের পারস্পরিক বিভ্রান্তিটুকু লক্ষণীয়।

চারদিকের চাপে পড়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি যে কোন পথে অশ্বমেধের বল্গাছাড়া ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে, বোঝা দায়। কেন্দ্রে এক নড়বড়ে সরকার, থেকে থেকে 'সমাজতন্ত্র'—সমাজতন্ত্র বলে চেচিয়ে উঠছে। অথচ আসল চাবিকাঠিতে হাত দিতে তারও ভয় কম নয়।

কেন্দ্রের সেই দুর্বলতা স্পষ্ট ছাপ রেখে যাচ্ছে প্রদেশ-গুলিতে। কিছুটা বলিষ্ঠতা দেখিয়েই আবার খেই হারিয়ে ফেলছে। মন্ত্রী

পতনের আশঙ্কা নিয়ে পার্লামেন্ট বসে। বাইশ বছরের শোষণের এইটেই হলো আশু পরিণতি। আগামী দিনগুলি আরো ভয়াবহ।

হাঁ, যা বলছিলাম, আমার শিল্পীবন্ধু আমাকে পছন্দ করে না। ওর ধারণা, আমি ঝোলে লাউ, অম্বলে কদু। রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা বলতে আমার কিছু নেই। চিন্তাশক্তিতে একেবারে দেউলিয়া বনে গেছি।

তবু আমি ওর কাছে যাই। মুগ্ধ বিস্ময়ে তার বিরক্তি মিশ্রিত কাজ দেখি। কয়েক কাপ চা আর প্যাকেট খানেক সিগারেট পুড়িয়ে ফিরে আসি। ...ষ্টুডিওর ভেতরে তো নড়ার জায়গা নেই। চারদিকে ছড়িয়ে আছে টুকরো টাকরা ফ্রেম, ভাঙা চেয়ার, রঙের টিউব, পচাফুল সমেত ধূলোমাখা ফুলদানি।

একদিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শিল্পী বললে, 'আমি বোধ হয় শীঘ্র গা ঢাকা দেবো'।

বললাম, কেন?'

'শালা কুত্তারা আমাকে নিস্তার দেবে না।'

কোন কুত্তা?

আর কথা নেই। শিল্পী নীরবে ধূমপান করছে। ধোয়ার অজস্র রেখা ওর মুখখানাকে ঝাপসা করে রেখেছে। শুধু তীক্ষ্ণ নাকটা দেখা যাচ্ছে, ছবির মতো ধারালো ফলা যেন সেই নাক। যে ধৈর্য নিয়ে সে ছবি আঁকে, ঠিক সেই ধৈর্য নিয়েই সে অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকতে পারে।...

সোলেমান, আমার শিল্পী বন্ধু কিন্তু পালাতে পারে নি।
হঠাৎ পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে তাকে।

অপরাধ? সে নাকি এমন একটি মারমুখী মিছিলে ছিল, যে মিছিলের হাতে কয়েকটি যুবক তাদের বিরুদ্ধ মতবাদের জন্য প্রাণ হারিয়েছে।... অথচ, আমার সমস্ত পরিচিত জনরা বলছে, কেসটা

সম্পূর্ণ সাজানো। শিল্পী ঐ দিন এই শহরেই ছিল না। ক'লকাতায় গিয়েছিল কিছু রঙ কিনতে। তাছাড়া তার যা রাজনৈতিক মতবাদ, তাতে সে ঐ মিছিলের সামিল হতে পারে না!

কিন্তু কে শুনছে সে সব কথা?

আপাততঃ সে রইলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী। বিচার-আচার হতে হতে বছর ঘুরে যাবে। শুনলাম, পুলিশ নাকি শেলের মধ্যে ঢুকিয়ে তাকে দারুণ মারধোর করেছে। নাক দিয়ে গল গল রক্ত ঝরেছে।

আমি কল্পনা করতে পারি, ঐ শিল্পী একদিন মুক্তি পাবে। বাতাসে ঘ্রাণ নেবে কোন ফুলের নয়, শুধুই বারুদের। দড়ির মতো পাকানো তুলির যে কয়টি টান সে দেবে তার চেয়ে জীবন্ত সৃষ্টি আর হয় না।

আজ এখানেই ইতি টানছি।

লিখতে লিখতে ক্লান্তি আসছে। তোমার উত্তর না পেলে আর উৎসাহ পাবো না।

প্রীতিসহ

সেনগুপ্ত।

প্রিয় সেনগুপ্ত,

ফিলিপাইনে বর্ষা এসেছে।

জুনের ভারী বাতাস ঝাপটা মারে। সামুদ্রিক গোঙানি অশ্রুত নয়। *সাত হাজার ছোট বড় দ্বীপের ফিলিপাইন এখন রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শে* অনন্যা। তোমাকে এই চিঠি লিখবার আগেই এই দেশের চৌহদ্দিতে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ঘুরে বেড়ালাম।

ফিলিপাইন সাত হাজার দ্বীপের দ্বীপ নিহারিকা হলেও মাত্র এগারোটি দ্বীপ মিলেই সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের আয়তনের চুরানব্বুই ভাগ দখল করে আছে।

আমি সমৃদ্ধ দ্বীপ লুজনে ছিলাম বেশ কিছুদিন। সেখান থেকে নৌকা যোগে সন্নিকটবর্তী কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপমালাতেও চক্কর খেয়ে এলাম। এ সব দ্বীপের আয়তন কিন্তু এক বর্গমাইলের ও কম। সবুজ ঝোপ ঝাড় আর দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত,—চোখ জুড়িয়ে যায়।

গিয়েছিলাম ভিসায়াস দ্বীপে। সেখানে পরিচিত হলাম তোমার মতো এক বাংঙ্গালী যুবকের সাথে। ম্যাডিক্যাল ম্যান। ১৯৬০ এ ফিলিপাইনে এসে আর ফিরে যান নি। যেতে পারেন নি এক
ফিলিপাইনে এসে আর ফিরে যান নি। যেতে পারেন নি এক
ফিলিপাইনী জমিদার-তনয়ার মোহে। এখানেই প্রাক্‌টিশ করছেন। পশার খারাপ নয়।

ভিসায়াস থেকে যেতে হলো সমুদ্রের আরো গভীরে,—দক্ষিণের মিণ্ডানা ও স্লুদ্বীপে। দ্বীপে দ্বীপে দীপ্ত ফিলিপাইন। মনে হয়, এত অজস্র দ্বীপ যেন তার চারপাশে কঠিন প্রকার গড়ে তুলেছে এবং উচ্ছল সমুদ্র হলো তার পরিখা।

লুজন হলো সবচেয়ে বড় দ্বীপ। আয়তন ৪০,৮১৪ বর্গমাইল। সমগ্র ফিলিপাইনের এক তৃতীয়াংশ। লিন্‌গায়েন উপসাগরএর পদচুম্বণ করে। আবেগে-উচ্ছ্বাসে এখানে এসে দাঁড়ালে নিজেকে ভাগ্যবান বলে ভাবতে ইচ্ছে হয়। ১৯৪১ এর ডিসেম্বরে জাপানী সৈন্যরা প্রথম এরই ধূলিধূসব সৈকতে নেমে এসেছিল।

আজ আমেরিকার পদলেহনকারী ফিলিপাইন কিন্তু সমৃদ্ধশালী দেশ! এর সম্পদ যেন সীমাহীন! খনিজ দ্রব্যের অঢেল সম্ভার। বনজ সম্পদ ও যথেষ্ট লোভণীয়। হ্রদ আর প্রস্রবনে সারা দেশটি

অনুপম। তটরেখার নিপুণ খাঁজ কুমারী মেয়ের মতো আকর্ষক,—জাহাজ আর ডিঙি নঙর করা খুব সহজ।

ফিলিপাইনের আদিম অধিবাসীদের দেখা প্রায় আর পাওয়া যায় না। আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে তারা। নাম নেগরিটো। বর্তমান সেনসাস অনুযায়ী সংখ্যা ত্রদের পঁচিশ হাজারের বেশী হবে না। নেগ্রকস, লুজান এবং প্যানায়ের পাহাড়ি অঞ্চলে তাদের বাস। ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে ওদের ছবি তুলে আনলাম। পুরুষরা পরে থাকে সামান্য নেংটি। মেয়েদের বুক অনাবৃত, কোমর আবৃত করা সামান্য এক চিলতে কাপড়ে।

এখন ফিলিপাইনের অধিবাসীদের শতকরা নব্বুই ভাগই হলো মালয় জাতীয়। ধর্মে তারা বেশীর ভাগই খৃষ্টান, কিছু মুসলমান এবং পৌত্তলিকও রয়েছে।

ফিলিপাইনের শিক্ষা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত হলো তাগালোগরাই সম্প্রদায়। এদের সংখ্যা বিশ লক্ষের কিছু বেশী। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও দেশের সমস্ত কর্ণধাররা এসেছেন এই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই।

ফিলিপাইনের অতীত ইতিহাস মনকে টানে।

মনে পরে, ১৫২১ সালের কথা। মসলা দ্বীপের সন্ধানে স্পেনীয় অভিযাত্রী বাহিনীর নেতা ম্যাজিলান ভাসতে ভাসতে এসে থেমেছিলেন ফিলিপাইনের কেবু দ্বীপে।

স্পেনীয়রাই ফিলিপাইনীদের খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। লেগাসপি নামে এক স্পেনীয় খৃষ্ট সাধু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ইউরোপীয়দের ধারা বজায় রেখে স্পেন ও ফিলিপাইনকে একদিকে যেমন খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করলো, অপরদিকে তেমনি চললো তাদের অর্থনৈতিক শোষণ।

স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদকে প্রবল বাধা দিয়েছিল ফিলিপাইনের দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান অধিবাসীরা। এদেরকে ধর্মান্তরিত করতে পারে নি স্পেনিশরা। মুসলমানরা বরাবরই তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রেখেছে।

১৮৩৪ সাল।

সুন্দরী ম্যানিলা সর্বপ্রথম বিদেশী জাহাজের কাছে উন্মুক্ত হোল। দেশী বিদেশী বাণিজ্য-জাহাজের আনাগোনা বৃদ্ধি পেলো। পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানে ফিলিপাইনীদের চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হতে চললো।

স্পেনিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের বিক্ষোভ ক্রমশই সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। দেশের শাসন কার্যে তারা অংশ চাইতে থাকে। ধর্মের মাধ্যমেই এই বিক্ষোভকে ধামাচাপা দিতে চাইলেন স্পেনীয় সরকার। সরকারের মদতে মাথা উঁচিয়ে উঠলো এক ধরণের রাজভক্ত বেনিয়া সম্প্রদায়। এদের শোষণ ক্ষমতাও কম নয়।

সংগ্রামী ফিলিপাইনের প্রধান নেতা ছিলেন ডঃ জস্ রিজাল। দেশ জুড়ে বিপ্লবের ডাক দেন। এক মুখোমুখি লড়াইয়ে স্পেনিয়ার্ডদের গুলিতে তিনি নিহত হন।

এই হত্যায় সমগ্র ফিলিপাইনে গণ-বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে ওঠে। স্পেনিশ সাম্রাজ্যের তখন ঘরে-বাইরে দারুণ বিপদ। স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ফিলিপিনেরা এই চূড়ান্ত লগ্নের পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে চাইলো।

মার্কিন কম্যাণ্ডার ডিউয়ী তাঁর নৌবহর নিয়ে উপস্থিত হলেন চীন সমুদ্রে। সেখান থেকে ক্রমশই এগিয়ে আসতে থাকেন ফিলিপাইনের দিকে স্প্যানিশ নৌ-শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলার জন্য।

ডিউয়ী স্প্যানিশ নৌ-বহরকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে

ফেললেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, ফিলিপাইন দখল করে নেবার। কিন্তু অত সৈন্য সঙ্গে না থাকায় সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো না।

কিন্তু যাবার আগে ডিউয়ী একটি মহৎ কাজ করেছিলেন। ফিলিপাইনের বিপ্লবীদের হাতে প্রচুর মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিয়ে আসেন। স্পেনিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে তাই শুরু হলে বিপ্লবীদের এক সফল সংগ্রাম।

কিন্তু চরিত্রে আমেরিকানরাও সাম্রাজ্যবাদী।

ফিলিপাইনকে ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে সৈন্য আর সামরিক রসদ পাঠিয়ে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে ফিলিপাইনকে তারা গ্রাস করে নেয়।

ফিলিপাইনের জনতা কিন্তু এই বৈদেশিক প্রভুত্ব মেনে নিতে আর রাজি হলো না। তাঁরা আগুইনাল ডোকে নামক এক গণনেতাকে তাদের প্রেসিডেণ্ট বলে ঘোষণা করলো।

ফলে শুরু হলো মার্কিনদের সাথে সংঘর্ষ। দীর্ঘস্থায়ী লড়াই। চলেছিল ১৯০২ খৃষ্টাব্দ অবধি। উন্নত সামরিক বলের অধিকারী আমেরিকানরা বিপ্লবীদের সমস্ত সংগঠনই প্রায় বিধ্বস্ত করে ফেলে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের একে একে কয়েদ করা হলো। যুদ্ধের সাথে সাথে দেশ জুড়ে নেমে এলো করুণ দুর্ভিক্ষ। চারিদিকে হাহাকার, দারিদ্র্যের নিস্পেষণ।…

১৯১২ সালে নির্বাচনে আমেরিকায় ডেমোক্রাটিক পার্টি ক্ষমতায় এলো। তারা ফিলিপিনোদের স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থানীয় লোকদের বসিয়ে মার্কিন অফিসাররা ক্রমশই সরে আসতে থাকেন।

১৯১৬ সালে জোনস্ আইন পাশ হলো। এই আইনে বলা হলো —যে মুহূর্তে ফিলিপাইনে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, আমেরিকানরা ফিলিপাইন থেকে তাদের সমস্ত অধিকার প্রত্যাহার করে সরে আসবে।

কিন্তু ১৯১৯ সালের নির্বাচনে আমেরিকায় ডেমোক্রাটিক পার্টি ক্ষমতা চ্যুত হলে সমস্ত উদার নীতিই আবার অবলুপ্ত হয়ে যায়। ফিলিপাইনে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে এলেন মেজর লিওনার্ড উড। উড ফিলিপিনোদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতাই কেড়ে নিলেন। নতুন করে শুরু হলো অত্যাচার। আন্দোলন ও বিক্ষোভে ফেটে পড়লো দেশ। সেই আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ে আমেরিকাতেও। গভর্ণর জেনারেল উডকে ম্যানিলা থেকে নিউইয়র্কে ফিরিয়ে আনা হলো।

আমেরিকা আবার আপোষের পথে অগ্রসর হয়। মার্কিন কংগ্রেসের একদল স্বতন্ত্র সদস্য দাবী জানালেন, ফিলিপাইনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হোক। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের বিশেষ ক্ষমতাবলে সমস্ত উদার প্রস্তাবগুলিকেই নাকচ করে দেন।

মার্কিন জনগণ কিন্তু বার বার সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে, ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দেবার জন্য। জনতার দাবীতেই ১৯৩৪ সালের ২৪শে মার্চ ফিলিপাইনের স্বাধীনতা আইন পাশ করা হলো। এই আইনের ব্যাখ্যায় বলা হলো ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জুলাই ফিলিপাইন পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।···

এরপরও আছে অনেক উত্থান-পতন। এলো জাপানীরা। কিছুদিন কর্তৃত্বের পর তারাও বিদায় নিলো। আবার এলো যুক্তরাষ্ট্র। ফিলিপাইন এখন স্বাধীন। তার রাজধানী ম্যানিলাতে এখন আমার মতো অজস্র বৈদেশিক কূটনীতিবিদদের আনাগোনা।

কিন্তু মার্কিন দেশের সাথে বিবিধ চুক্তিতে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ ফিলিপাইনকে ঠিক সার্বভৌম দেশ বলে মনে হয় না। হোয়াইট হাউসের চেতনাতেই সে চিন্তা করে, আমেরিকার ইচ্ছাতেই গণ-আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করে, আর পেন্টাগণের পেটুয়া হয়ে মার্কিন সমর দপ্তরের মস্ত এক বিশ্বস্ত ঘাঁটি হয়ে বসেছে। এখানকার গণ-

অসন্তোষ সহজেই অনুভব করা যায়।···

গতকাল সন্ধ্যায় আমি একটু বেহিসেবী হয়ে পড়েছিলাম। অনেক দিন পর। এক জাপানী বন্ধু জুয়াংয়ের সাথে 'রেঁস্তোরা টম্বা'তে গিয়ে প্রচুর এ্যালকহল টেনে নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো ঠিক যেন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সদ্য সমগ্র ফিলিপাইন চক্কর খেয়ে এ দেশটাকে যেন খুব ভালোভাবেই চিনতে পেরে গেছি।

জুয়াং আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম

জুয়াং বলছিল, "এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমরাই যেন ফিলিপাইনের হর্তা-কর্তা বিধাতা!"

আমি বাঁকা হাসলাম।

একটি তরুণী আসছিল এই রেঁস্তোরার দিকে। তার মাথায় কোঁকড়া চুল, কোন ফিতা নেই, বিস্ময় চকিত মুখ।

জুয়াং ওকে দেখামাত্রই দ্রুত এগিয়ে আসে। মেয়েটির হাত চেপে ধরে একরকম টেনে আনে আমার কাছে। মহাস্ফূর্তিতে বলে ওঠে, "এ মেয়েটি তোমাদের দেশের গো,—নাম জিন্নাৎ বেলা, আলজেরিয়ান।"

আমি অপ্রতিভ হলাম, "আমি আলজেরিয়ান নই, দেশ আমার মিশর।"

মিস্ বেলা স্মিত হেসে বললেন, 'আমি নামেই আলজেরিয়ান, আসলে সে দেশের স্মৃতিটুকুও এতদিনে মুছে গেছে আমার মন থেকে।···তবে আমার এক ভাই সিনাই যুদ্ধে আপনাদের হয়ে লড়েছিল এবং আজ পর্যন্ত তার কোন খোঁজ আমরা পাইনি।"

চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি নাম তাঁর?"

—"স্যাসোন বেলা।"

স্যাসোন বেলা!

নামটা আমার পরিচিত। লোকটিকেও আমি বারেকের জন্য দেখেছিলাম সুয়েজে। খুব লম্বা নয়, দোহারা চেহারা। ভালো

হেলিকপ্টার ড্রাইভার ছিলেন। মিশরের বিশাল মিগ বাহিনী দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন: আর যাই হোক আকাশ পথে আমাদের দাপট বজায় রাখতে পারবো!

কিন্তু কোথায়?

বাস্তবে তো হলো না।

ভয়ানক ভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে সেই মাত্র সপ্তাহখানেকের তিক্ত যুদ্ধের কথা! কেন এমন হলো? কেন এত সহজে গুড়িয়ে গেল আমাদের পাঁজর? যুদ্ধের পূর্বলগ্নে যে স্বপ্ন, যুদ্ধ শেষে তা রক্ত বমনে পরিণত। বাতাস হাহাকার করে মরে। সিনাইয়ের অট্টহাসি শোনা যায়। কায়রোর জ্বলন্ত প্রদীপ যেন কার ফুঁৎকারে নিভে গেল। এই শতকের সবচেয়ে গ্লানিময় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমাদের।

যুদ্ধশেষে পোর্ট সৈয়দে মিলিটারি হসপিটালে দেখা করতে গিয়েছিলাম কর্ণেল হামিদের সাথে। সিনাই যুদ্ধের এক গ্রুপ ক্যাপ্টেন। হাঁটু দুটো ইস্রায়েলী গোলায় একেবারে থেৎলে গেছে। সাতাশটা অপারেশন হয়েছে হাঁটুর টুকরো টুকরো হাড়ের কুচিগুলো সেট করতে। কোনদিন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন বলে ভরসা হয় না। মুখ চোখ মরু উত্তাপে একেবারে ঝলসে গেছে। দিনের মধ্যে পাঁচবার ঘন ক্রীম মালিশ করতে হচ্ছে তাঁর মুখে। আমি দেখছিলাম হামিদের চোখ দুটো,—জলে টস টস করছে। সিনাই যুদ্ধের সাহসী সেনানী হামিদ কাঁদছেন।

আমি কিন্তু দিনের পর দিন সেই আহত সৈনিকের মাথার কাছে বসে সিনাই যুদ্ধের বিক্ষিপ্ত বিবরণী শুনেছি! তারপর ভেবেছি, কেন আমাদের এমন বিপর্যয় হলো! অনেক কম সংখ্যক সৈন্য নিয়েও মসে দায়েন আমাদের বিধ্বস্ত করতে পারলেন কোন যাদুবলে? ···

যুদ্ধের ঠিক এক সপ্তাহ আগের কথা।

সিনাইয়ের বুকে হামিদ তাঁর সবুজ রঙের সামরিক জিপে চেপে চক্কর খাচ্ছেন। এ শিবির থেকে সে শিবির। একটা পারস্পরিক যোগাযোগে সুনির্দ্দিষ্ট আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা আঁকতে চান। কোন এক চেক পোষ্টের সামনে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। হাত ঘড়িতে সময় ও তারিখ দেখলেন। সময় সকাল দশটা, আর তারিখ ২৭ শে মে, ১৯৬৭। সামনেই আদিগন্ত ধূ ধূ মরুভূমি। মাঝে মাঝেই মিশরীয় চেক পোষ্ট। টমিগান আর সাব মেশিনগান হাতে অতন্দ্র আরবী প্রহরী। তেল আভিভের কোন সন্তান সেখানে সহজে প্রবেশ পথ পাবে বলে মনে হয় না। হামিদ ভাবলেন, এই মরুভূমির বুক চিরে মিশরীয় সাঁজোয়া বাহিনী অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারবে। এগিয়ে যেতে পারবে ইহুদী অধিকৃত বীরশোভা শহর পর্যন্ত। মাথার উপর বোঁ বোঁ চক্কর খাচ্ছে একটি হেলিকপ্টার। হামিদ পকেট থেকে রুমাল বের করে সহাস্যে নাড়াতে থাকেন।··· প্রতিটি চেকপোষ্টে কাঠের উপর আঁকা সিনাইয়ের মানচিত্র। সুয়েজের নীল রেখা থেকে আরম্ভ করে বীরশোভার হলুদ স্তম্ভটা পর্যন্ত। দু'চারজন অফিসার একটু যেন অলস ভঙ্গীতে আলোচনা করছেন। প্রত্যেকেরই সাথে রয়েছে একটি করে রিভলবার এবং জলের বোতল। নিত্যনতুন সামরিক বুলেটিন নিয়ে তাঁদের জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই।

যুদ্ধ তখনো অনেক দূরে।

অথচ, প্রত্যেকেই আশঙ্কা করছেন, এই বুঝি কোন দূরপাল্লার মার্কিন হুইটজার থেকে ছুটে আসা শেল প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়বে। গুমোট ভাব। অনিশ্চয়তায় বিজাতীয় অস্বস্তি। কপাল ঘামছে। ঘন ঘন তাকাতে হয় পেতলের মতো আকাশের দিকে। ঘুরতে থাকে সামনে, পিছনে,···আদিগন্ত দিকচক্রবালে।

মাঝে মাঝেই ঝড় ওঠে। কল্পনাতীত মরু-ঝড়। এও যেন এক ধরনের যুদ্ধ। মুখ গুঁজে শুয়ে পড়তে হয়। তারপর ঝড় থামলে দেখা যায়, প্রত্যেকের দেহে ধুলোর পুরু লেয়ার পড়ে গেছে।...

হামিদ একটি চেকপোষ্টে ঢুকলেন। অপারেশান অফিসার আসরফ্ কাঠের ম্যাপে দৃষ্টি বোলাচ্ছেন।...নবাটেইনস্ নগরের উপর তাঁর ষ্টিকটা থরথরিয়ে নড়ছিল। এখানে ইস্রায়েলীরা ঘাঁটি করেছে··· তারপর আবু আঘিলা···নিৎসানা···বীরশোভা...ইত্যাদি!

আসরফ্ বললেন, 'আমার তো মনে হয় চারদিক থেকে এগিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করবার ক্ষমতা ইহুদীদের থাকবে না।...কারণ, ওদের ব্যস্ত থাকতে হবে লেবানন-জর্ডন ও সিরিয়া সীমান্ত নিয়েও!···'

হামিদ উত্তর দেন না। শুধু তাঁর মনে হলো, এই থম্থমে ভাবটাই যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, শত্রু কত শক্তিশালী!

সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো। রুটি সেঁকার মতো রোদ চামড়াকে ঝলসে দিয়ে যায়।···শুধুই মনের জোরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব। একটু হতাশা মনে এলেই তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর।

একজোড়া নতুন বুট নিলেন হামিদ। আসরফের মুখে সুন্দর স্মিত হাসি। আরো দু'জন কমিশনড অফিসারের সাথে হামিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজনের মুখটা বিরাট, সব সময় যেন হাসছেন, তীক্ষ্ণ নাশা। আর একজন রোগা লম্বা।

'আমরা একত্রিত হতে পেরে কত আনন্দিত!'

—বিশালদেহী অফিসার বললেন।

তাঁরা আলোচনা করছিলেন যুদ্ধ নিয়ে। কিন্তু তেল আভিভের আক্রমণাত্মক শক্তি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা তাঁদের নেই।··· ইস্রায়েলীদেরও কী মিশরীয়দের মতো সেকেণ্ড লাইন অব্ ডিফেন্স [second line of defence] আছে?···অত সৈন্য তো থাকবার কথা নয়!···কতগুলো ট্যাঙ্ক তারা এই মরুযুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে?···

কী কী ট্যাঙ্ক আছে ওদের? শেরম্যান, সেঞ্চুরিয়ান···আর?··· কোন পথে আসতে পারে মসে দায়েনের সাঁজোয়া বাহিনী? মিশরীয়দের গ্রাউণ্ড-মাইনগুলির সম্মুখীন হতে তারা কী বাধ্য নয়? অসংখ্য মাইন পোতা আছে এই মরুপথে। অসংখ্য!

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, প্রথম আক্রমণ করবে কে? এবং কোন দিক থেকে?···

হামিদ দেখছেন, সমস্ত মরুভূমিতে অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর মতো জিপ ও বুলডোজারগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখনো সামরিক ইঞ্জিনীয়াররা পথ তৈরী করছেন। একেবারে শত্রুর মুখোমুখি পৌঁছে যাবার চেক-পোষ্টগুলি পর্যন্ত ভালো রাস্তা থাকা দরকার। পুরো রুশ কায়দায় যুদ্ধ করবে মিশরীয় সৈনিকরা। প্রথম সারিতে যারা থাকবে, তারা মূলতঃ পর্যবেক্ষণকারী। এরা দ্রুত খবর পাঠাবে পিছনের শক্তিশালী বাহিনীকে। শত্রুর আক্রমণাত্মক ক্ষমতারও একটা হিসেব করে ফেলবে তারা। প্রয়োজন হলে খবর যাবে কায়রোতে,—ঝাঁকে ঝাঁকে মিগ বোমারু ছুটে আসবে শত্রুকে তছনছ করে দিতে।

পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিগুলিও কম শক্তিশালী নয়। যে কোন আক্রমণই তারা অন্তত বারো ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারে। ইতিমধ্যে মূল বাহিনী এসে হাজির হয় এবং শুরু হয় প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত!

এই হলো আমাদের মরুযুদ্ধের প্রস্তুতি!

কিন্তু মনে খুব একটা আশার ছবি আঁকতে পারছেন না কেউই! ঘুরে-ফিরেই মনে পড়ে যায় ১৯৫৭ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের পুরো সুযোগ নিয়ে সে বছর ইস্রায়েলী বাহিনী ঢুকে পড়েছিল সিনাইয়ে। মিশরীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ তচনছ করে দিয়েছিল তারা মাত্র কয়েক দিনের যুদ্ধেই।···ইতিমধ্যে কায়রো অবশ্য অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে! নাসেরের নেতৃত্বে আরো বেশী সংঘবদ্ধ হয়েছে জাতি। আরব রাষ্ট্রগুলিও আজ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে

সংঘবদ্ধ। একযোগে আক্রমণ চালাবে তারা। তবু মনে একটা গুমোট আশঙ্কা,—ইস্রায়েলের আক্রমণ ক্ষমতা সেই তুলনায় না জানি কত বিরাট!···

২৮শে মে হামিদ খবর পেলেন, আসরফ এবং আরো চারজন মিশরীয় কমিশনড অফিসার হঠাৎ বন্দী হয়েছেন ইস্রায়েলী বাহিনীর হাতে! আশ্চর্য! এঁরা পাঁচজন একটি জিপে চেপে মরুভূমির আর এক প্রান্তে ছুটে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, সেই অরক্ষিত অঞ্চলে কতকগুলো নতুন চেকপোষ্ট বসানো যায় কিনা, বিবেচনা করা। কিন্তু ইহুদিরা যে সেই অঞ্চলে ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছে, কল্পনাও করতে পারেন নি।

হঠাৎ আসরফের জিপ ঢালু পথ বেয়ে সোজা এক শত্রুর ট্রাকের সামনে গিয়ে পড়ে!···

খবর এসেছিল আর এক পর্যবেক্ষনী ঘাঁটি থেকে। বায়নাকুলারের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল সমস্ত ঘটনাটা!···

সুতরাং যুদ্ধ আর দূরে নয়।

রোমাঞ্চিত হলেন হামিদ।···

যুদ্ধের জন্য সমগ্র আরবভূমি প্রস্তুত। ৩০শে মে, বুধবার রাজা হুসেন তাঁর এতদিনের অভিমান ত্যাগ করে হাত মেলাতে এলেন নাসেরের সাথে। স্বাক্ষরিত হলো এক প্রতিরক্ষা চুক্তি। বেতারে ধ্বনিত হলো হুসেনের কণ্ঠস্বর : the hour of decision has arrived.

হামিদের মনে হলো, বাতাসে যেন ভেসে এলো : the hour of attack and re-attack has arrived.

শুরু হয়ে গেল দারুণ প্রস্তুতি। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান! প্রতিটি মুহূর্ত উত্তেজনায় ভরপূর। বালুর রাজত্বে গভীর ট্রেন্স খোঁড়া হচ্ছে নতুন নতুন, বালির বস্তা এনে সাজানো হচ্ছে, ট্রান্সমিটারের সরু সরু নল উঁচিয়ে অনেকেই দারুণ ব্যস্ততায় 'কল' করছেন নিম্নতম

ও ঊর্দ্ধতনদের··· হ্যালো··· হ্যালো···হ্যালো !···

দেশাত্মবোধক গান গাইছে রোদ-ঝলসানো সৈনিকেরা সেই মুহূর্তে অনুভূত হচ্ছে, সমগ্র আরবভূমি জেগে উঠেছে। মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক, আলজেরিয়া, লেবানন, সুদান ·সব একাকায়।

দুই প্লেটুন জোয়ানের মাঝে দাঁড়িয়ে ভরাট গলায় গান ধরলেন কর্ণেল হামিদ :

"দুনিয়াটা দিলদারদেরই জন্য। কাপুরুষের নেই স্থান,—
এই পতাকা রইলো উঁচুতে, নামবে না থাকতে দেহে প্রাণ।
উঠবে ঝড় মরু পথে, রক্ত শুষবে শুকনো মাটি,—
শত্রু যত হবে খতম, ভীরুদের লাগবে দাঁত-কপাটি !
চওড়া বুকে আঁকছি আমরা নতুন ইনসান।
চল-চল আর···এগিয়ে চল, তুফান এলো এ প্রাণ !···"

'কায়রো থেকে তেল অভিভ কত দূর ?'

ধূ ধূ মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে সেদিন ভেবেছিলেন কর্ণেল হামিদ। শুকনো বাতাসের গোঙানিতে প্রত্যয়ের অভাব, যেন কে বার বার কানের কাছে ফিস ফিসিয়ে উঠছে , অব তেল আভিভ দূর অস্ত !

পাঁচ জন জাঁদরেল মিশরীয় অফিসার এত সহজে ইহুদিদের ফাঁদে পা দিলেন !

অশুভ লক্ষণ !

যুদ্ধের এই পূর্বক্ষণেই হতাশায় পেয়ে বসেছে তরুণ হামিদকে। ওঁর ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে : খোদা-ই হাফেজ !

নিজেদের উপরই তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন হামিদ। তাঁর বুঝি মনে হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ লোকের শুভেচ্ছা নিয়েও নির্বোধ রণনীতিকে অনুসরণ করতে চলেছেন তাঁরা। মরতে ভয় পায় না কেউ। কিন্তু আচমকা সাপের মাথায় পা দিয়ে আত্মহত্যার কী মানে আছে ? নিজেকে কিছুক্ষণ ভুলে থাকতে চাইলেন হামিদ।

কোন এক কাজের অছিলায় ফিরে এলেন সুয়েজের তীরে। নীরবে ঢুকে পড়লেন একটি পরিচ্ছন্ন বারে। অনেক আগে ফরাসী মালিকানায় চলতো এটি। এখনো প্যারিসের ভাবধারা বজায় আছে এখানে। চলছে নাচ গান। অ্যাকর্ডিয়নে ফক্স্-ট্রটের হালকা বাজনা বেজে চলেছে। নিয়নের সমারোহ আর কাপড়ের মালায় প্রতিটি কেবিন খদ্দেরদের মোহমুগ্ধ করে রাখে। হোটেলের ড্যান্সরুমে একদল নর-নারী,—নাবিক, সৈনিক, ভ্রমণবিলাসী,—ভীষণ উম্মাদনায় নেচে চলেছে।

কর্ণেল হামিদ কোনদিন নাচের ভক্ত নন। তবু একটি মেয়ের হাত ধরলেন তিনি। মেয়েটির মুখে মেচেতা, সস্তা পাউডারের প্রলেপ, নাচবার সময় মনে হয়েছিল, ওর বুক যেন দুটো তুলোর বস্তা। নাচ শেষে মেয়েটিকে প্রচুর শেরি-ব্যাণ্ডি খাইয়ে বিদায় নিলেন হামিদ ...

তারপর এলো সোমবার। এলো সেই তাপদগ্ধ অভিশপ্ত ৫ই জুন। সিনাইয়ে মিশরীয় ব্যূহ ভেদ করে প্রথম গর্জে উঠলো ইস্রায়েলী কামান। Um Katef এর দ্বিতীয় ডিভিশন বাহিনী প্রথম সম্মুখীন হলো সেই সুতীক্ষ্ণ আক্রমণের। ইহুদিদের আক্রমণ যে এত তীক্ষ্ণ ও তীব্র হতে পারে, ধারণা ছিল না কোন মিশরীয় কমাণ্ডারের। মাত্র আধ ঘণ্টার যুদ্ধে বেশ কয়েকটি আউটপোষ্টের পতন ঘটলো।

ইস্রায়েলী সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কগুলি গজরাতে গজরাতে ছুটে আসছে নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। উত্তর ও দক্ষিণ,—দু'দিকেই সাঁড়াশি আক্রমণ চলেছে! আমরাও গোলা ছুড়েছি, কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে কোন আক্রমণই বিশেষ ফলপ্রসু হয় নি। সর্বোপরি হামিদ অনুভব করতে পারলেন, ইস্রায়েলের তুলনায় মিশরের প্রস্তুতির বিশেষ ঘাটতি আছে।...সেই ভয়াবহ রণক্ষেত্রে ইস্রায়েলী শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মসে দায়েনের যুবতী মেয়ে ইয়েল দায়েন। যুদ্ধের ধারা বিবরণী দিচ্ছিলেন তিনি। আর ওয়ারলেসে ভেসে আসছিল স্বয়ং মসে দায়েনের উদ্দীপক কণ্ঠস্বর:

"Soldiers of Isreal...they are greater than us in numbers but we will hold them. We are a small nation but we are determined. We seek peace but we are ready to fight for our lives and our country...on this day our hopes and our security are with you."

জীবন ও নিরাপত্তার লড়াইয়ে ইহুদিরা মরিয়া।

আর মিশরীয়রা দিশাহারা, হতবাক ও বিষণ্ণ।

সর্বনাশ যা হবার, তা যুদ্ধ শুরু হবার মুহূর্তেই হয়ে গেছে। ঐ অভিশপ্ত ৫ই জুনই মিশরের বিশাল বিমান বহর সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। একটি মিগও আর অক্ষত নেই। অথচ, মৃত্যু ওদের আকাশে হয় নি। মৃত্যু হয়েছে এই মাটির বুকেই শায়িত অবস্থায়! প্রায় এক হাজার ইস্রায়েলী বিমান ঝড়ের বেগে ছেয়ে ফেলেছিল মিশরের আকাশ। কোন মিশরীয় ফাইটারকে তারা উড়তে সুযোগ দেয় নি। প্রতিটি বিমান ঘাঁটি মুহূর্তের মধ্যে এক একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়। মাত্র এক ঘণ্টার বিমান-আক্রমণে কায়রোর বিমান বাহিনী একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। জর্ডন এবং সিরিয়ার বিমান বাহিনী ও প্রচণ্ড আঘাত পেলো। সেই একদিনের যুদ্ধেই মোট ৪৫২টি আরব বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। এর মধ্যে মিশর হারালো ৩৪০টি, সিরিয়া ৬০টি, জর্ডন ২৯টি এবং ইরাক ২৩টি। অথচ এই প্রায় সাড়ে চার শ' বিমানের অধিকাংশই ছিল সর্বাধুনিক ফাইটার,—মিগ ২১, মিগ ১৯, সুখয়,··· হ্যাণ্টারস্, টুপোলেভস্, ইলিউসাইনস্ ইত্যাদি।

ঐ ৫ই জুনের যুদ্ধেই মিশরের ১৯টি বিমান ঘাঁটি বিধ্বস্ত হয়, ২৩টি রাডার স্টেশন একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে ইস্রায়েলী বিমানগুলি নজর দিলো মিশরের

গ্রাউণ্ড ফোর্সের উপর। শুরু হলো সিনাইয়ের বুকে বীভৎস বিমান আক্রমণ!

গভীর হতাশায় কর্ণেল হামিদ দেখলেন, তাঁদের মাথার উপর শুধুই ইস্রায়েলী বিমান চক্কর খাচ্ছে। সেখানে কোন আরব বিমানের অস্তিত্ব নেই। এক অসম যুদ্ধে একে একে মুখ থুবড়ে পড়ছে মিশরীয় ইউনিটগুলি।···

৬ই জুনের রাত্রিটা যেন বেশি রকমের অন্ধকার। কর্ণেল হামিদের মনে হলো, তিনি যেন অরণ্য দেখছেন, এই বড় বড় বালির প্রাচীর যেন গাছ। ক্রমাগত বিপর্যয়ের সংবাদে গোটা সাঁজোয়া বাহিনীটা যেন আধমরা হয়ে পড়ে আছে। প্রতিটি সৈনিকের মুখ তামাটে। রোদ-ঝলসানো কালো কালো দাগ।

প্রতিরক্ষার প্রথম সারি মুছে গেছে। দ্বিতীয় সারিও বিধ্বস্ত। এবার তৃতীয় সারি আংশিক ভাবে আক্রান্ত। রাতের অন্ধকারে আকাশ চিরে অগ্নি গোলকগুলি এ-ধার ও-ধার এসে ফেটে পড়ছে! প্রচণ্ড শব্দ! ধূলো-বালির ঝড়! অহরহ শেল ছুটছে এ তরফ থেকেও। কিন্তু ফললাভ ঘটছে বলে মনে হয় না। নিজেদের উপর আর আত্মবিশ্বাস নেই। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন কর্ণেল হামিদ। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেছে গোটা মিশরীয় বাহিনীর।

এই মরুপথ। হিমেল প্রসারতা। দিনে ভয়াবহ উত্তপ্ত। মরুপথ থেকে জনপথ কত দূরে! জন সাধারণ,···কায়রোর লোকেরা কি ভাবছে? সৈন্যদের এই বিপর্যয়ে ওদের মানসিকতা সহজেই অনুমেয়। কাঁধ দুটো টান করলেন কর্ণেল হামিদ, পিঠটা লোহার রডের মতো খাড়া হয়ে ওঠে, আপন মনে অন্য এক সুরে যেন বিড় বিড়িয়ে উঠলেন, "আমি সন্তানের বাবা নই। মরতে আমার ভয় নেই। ···কিন্তু কথা হলো, আলেকজেন্দ্রিয়ার সমর-শিক্ষণে এতদিন যা শিখেছিলাম, তার কি সবটাই মধ্যযুগীয়?—back dated?··· না,

আমাদের গুপ্তচর বিভাগটা একেবারে অচল, গদাই লস্কর। কিন্তু রুশ-বিভাগটা একেবারে অচল, গদাই লস্কর। কিন্তু রুশ-বন্ধুরা কী করলেন? ...ওরা আমাদের সচেতন করে দিতে পারে নি? ...বন্ধু না ছাই! সব মজা দেখছে। ...আর আমেরিকা! পিশাচ আমেরিকা!...

প্রচণ্ড অভিমানে কর্ণেল হামিদের যেন কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। সাধারণত খুব ঠাণ্ডা মাথার যুবক তিনি। অমায়িক ব্যবহারের গুণে এই বছর খানেক আগেও একটি ভারতীয় পাঞ্জাবী মেয়েকে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন,—এখন ও চণ্ডিগর থেকে মাঝে মাঝেই প্রেমমুগ্ধ চিঠি আসে তাঁর কাছে।

কিন্তু এইক্ষণে তিনি ছুটে গিয়ে পর পর তিনবার লাথি মারলেন কামান ফিট করা কনভয়টিতে। কনভয়টির গায়ে চকখড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে "বিজয়া"। তাঁর প্রেমিকার নাম।

ড্রাইভারকে একরকম টেনে আনলেন কর্ণেল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'Drive, and let me go ahead !'

বিস্ময়ে বিরক্তে লোকটার লাল চোখ দুটো গোল গোল ওঠে।

কি যেন বলতে চাইলো।

কিন্তু তার আগেই আর একবার চেচিয়ে উঠলেন কর্ণেল হামিদ: 'Drive, and let me go ahead !'

অভাবনীয় দৃশ্য!

রাতের অন্ধ বিশাল সিনাইয়ের বুকে ছুটে চলেছে একটি বিশাল মিশরীয় কনভয়! একেবারে একক। সাক্ষাৎ যমের মতো সে ছুটে চলেছে অগুণিত শত্রুকে ঘায়েল করতে।

সমানে কামান দেগে চলেছেন হামিদ। দর দর করে ঘামছেন। হাত-পা-জানু—সমস্ত কাপছে থর থরিয়ে। মাথার ভিতরটা শিথিল। শুধু চোখ দুটো জ্বলছে। রাতের আকাশে লক্ষ লক্ষ

তারাগুলিও যেন এই মুহূর্তে বিস্ময়ে থামিয়ে দিয়েছে তাদের মিটিমিটি হাসি। দমকা বাতাসে ধুলো-বালির ঝড় ওঠে, যেন থামিয়ে—দিতে চায় হামিদের গতি।

মসে দায়েনের বাহিনী হতচকিত! ঠিক এ ভাবে যে আক্রান্ত হতে পারে ভাবতে পারে নি। সাপের মতো এঁকে বেঁকে ঘুরছে মিশরীয় কনভয়টা। আর এক একটা শেল এসে ফেটে পড়েছে একেবারে ইস্রায়েলী ঘাঁটি গুলির উপর। চারদিকে আগুন ধরে গেছে। লেলিহান শিখা গুলিতে আকাশ রক্তাভ,—চারদিক লালে লাল!

মুহূর্তের স্তব্ধতা!

তারপরই গর্জে উঠলো এক সাথে অজস্র ইস্রায়েলী কামনা।···জখম হাঁটু নিয়ে গাড়ীর পাটাতনে থুবড়ে পড়লেন হামিদ। দক্ষ ড্রাইভার সাঁ সাঁ ছুটে ফিরে আসতে থাকে। সেই আঁকা বাঁকা গতি। শত্রুর সংখ্যাতীত আক্রমর্ণ থেকে ঠিক গা বাঁচিয়ে ছুটে আসছে।···

সেনগুপ্ত মিশরীয় সেনারা কাপুরুষ নয়। যোদ্ধা হিসাবে তারা প্রত্যেকেই অনন্য। কিন্তু সামরিক সাফল্য হচ্ছে অনেকটা সূক্ষ্ম গণিতিক নিয়মের মতো। সামান্য ভুল হলেই হিসেবে আর মিলবে না। দীর্ঘশ্বাস আর হতাশাই পাথেয় হয়ে দাঁড়াবে।

প্রেসিডেণ্ট নাসের তাই সেই গণিতিক ভূলকে এবার শুধরে নেবার চেষ্টা করছেন। আমার তো মনে হয় পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা কখনো কোন আলোচনা সভার মাধ্যমে মিটবে না। বৃহৎ চতুঃশক্তি যতই গালভরা কথা বলুক না কেন, ওদের কোন সদিচ্ছাই আন্তরিক নয়। সুয়েজের বুক দিয়ে এখনো অনেক রক্তস্রোত হইবে। অনেক।

তাই আমাদের সঞ্চয় করতে হচ্ছে প্রচুর শুকনো বারুদ।

নিঃসন্দেহে রাশিয়া আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলেছে। তার এই পর্যন্ত সাহায্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আসলে রুশেরা আমাদের সাহায্য করবেই। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চৈনিক প্রভাব দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। আর পশ্চিম এশিয়ায় নিজের প্রভাব বজায় রাখবার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই সচেষ্ট হবে রাশিয়া।

এক চোখ মসে দায়েন কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন আমাদের প্রতিটি প্রস্তুতির উপর। সময় ও সুযোগ পেলেই দু'এক পশলা বোমা বৃষ্টি করে যাচ্ছে ইস্রায়েলী বিমানগুলি। আমাদের শক্তিকে সংহত করতে দেবে না কিছুতেই।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইস্রায়েলের সামরিক শক্তি আমাদের তুলনায় অনেক বেশী এখনো কার্যকরী। অথচ, মিশরকে লড়তে হবে। লড়তে হবে তার নিজেরই শক্তির উপর নির্ভর করে। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলির আদর্শহীনতা সহজেই লক্ষ্যণীয়। আরবীয় গেরিলাদের তারা সাহায্যের বদলে আক্রমণ করছে! এক ধরণের কুশ্রী হীনমণ্যতায় ভূগছে তারা। একমাত্র সুদান এবং মিশর এর ব্যতিক্রম!

আকাশ অন্ধকার। বাতাসে বারুদের ঘ্রাণ! প্রতিটি স্নায়ুকে সজাগ রেখে আমরা আমাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রীতিমুগ্ধ

সোলেমান

প্রীতি নিবেদন সোলেমান,

তোমার চিঠিখানা মর্মস্পর্শী। বিশেষতঃ কর্ণেল হামিদের বেদনা বিধুর অনুভূতি আশ্চর্য বাণীরূপ লাভ করেছে তোমার চিঠিতে। মধ্য প্রাচ্যের ঘটনার প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক যে ঘটনা আমাদের সবচেয়ে নাড়া দিয়ে গেল, তা হলো সুকর্ণের মৃত্যু। আমার তো মনে হয় এর চেয়ে ট্র্যাজিক ডেথ্ আর হয় না। বাটাভিয়ায় প্রাসাদে একদা যিনি আজাদী ইন্দোনেশিয়ার ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে 'ইন্দ্রপতন'-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারতো। হতে পারতো কত সমারোহ, রচিত হতো কত স্মৃতিস্তম্ভ, পুষ্প স্তবকে স্তবকে ঢাকা পড়ে যেত তাঁর মর দেহ, সৈনিকরা জানাতো অন্তিম গার্ড অব অনার, দেশব্যাপি শোক পালন চলতো অন্তত সাতদিন ধরে, দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের বাধা ধরা শোকলিপি গুলি আসতো অনবরত, বেতারে দিনের পর দিন শোনা যেত মহান নেতার অজস্র গুণপনা!···

এই সমস্ত সম্ভাবনা ছিল। এর উপযুক্ততাও ছিল সুকর্ণর।
অথচ, কিছুই হলো না। তুখঃ নয়, রাগ নয়, যেন বড় অভিমানেই নীরবে বিদায় নিলেন 'আজীবন প্রেসিডেন্ট'। মৃত্যুর আগে দ্বিপ্রহরের আকাশ হয়তো খুঁজছিলেন সুকর্ণ। অবশ্য অগ্নিক্ষরা সূর্যকেও তাঁর আর বিশ্বাস ছিল না। মরণ-লগ্নেও দৃষ্টিতে তাঁর সন্দেহ, জ্বালা আর উপেক্ষা। পাশাপাশি যারা ঘুর ঘুর করছিল, সুকর্ণ জানতেন, তারা কেউই তার বন্ধু নয়। বঞ্চনা ভরা সমস্ত দেশের উপর দারুণ অভিমান নিয়ে বিদায় নিলেন ইন্দোনেশিয়ার কর্ণ। সুকর্ণ।

অনবরত বারুদের ঘ্রাণ এসে লাগছিল যেন নাকে। পড়ন্তি জীবনের সমস্ত স্থবিরতার হাত থেকে মুক্তির জন্য তীব্র আকুলতায় তু'টি হাত উপর পানে তুলে ধরলেন সুকর্ণ,—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর জর্জরিত প্রাণবায়ু মহাশূণ্যে গেল মিলিয়ে।

একটা যুগ শেষ হয়ে গেল।

সত্যি ভাই, ২১শে জুন সুকর্ণের মৃত্যুতে আমার মনে হলো, আফ্রো-এশিয়ার ইতিহাসে একটি যুগের অবসান ঘটলো।

যুগটা ছিল সংগ্রামের। যুগটা ছিল মুক্তির। এই যুগকে আলোকিত করে রেখেছিলেন তিন নেতা,—আমাদের নেহেরু, ভিয়েতনামের হো-চি-মিন আর ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ।

এক অর্থে সুকর্ণ নেহেরু বা, হো-চি-মিনের চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেছিলেন। নেহরু অবিভক্ত ভারতের কর্ণধার হতে পারেন নি,—বিভক্ত ভারতের পাকিস্তান তাঁকে অনবরত জ্বালিয়েছে।

হো-চি-মিন্‌ও দুই ভিয়েতনামের সংযুক্তিকরণ দেখে যেতে পারলেন না।

একমাত্র সুকর্ণই পেরেছিলেন সামগ্রিকভাবে ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন করতে। সেদিক থেকে তিনি এক অনন্য পুরুষ। কৃতি সংগ্রামী নেতা। মুক্তিকামী এশিয়ার প্রেরণাস্থল।

মনে আছে, মাত্র একযুগ আগেও এই নেতার নামে আমাদের বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠতো। অমেয় প্রত্যাশায় তাঁর দিকে তাকাতাম আমরা। আজকের দিনে নাসেরের উপর আমাদের যেমন আস্থা, সেইসব দিনে সুকর্ণও ছিলেন আমাদের কাছে তেমন প্রেরণার উৎস।

জাকার্তার প্রাসাদে সুকর্ণ যে বক্তৃতা দেন, তার বিপুল অনুরণন অনুভূত হতো আমাদের দিল্লীর লালকেল্লায়। সুকর্ণকে ভাবতে গেলেই মনে পড়ে যেত তাঁর অতীত। একটি লোকের নামে সাথেই যেন গোটা দেশের পরিচয়। যুগ যুগান্তের ওপার থেকে জনকল্লোলের মতো ভেসে আসতো তাঁর সংগ্রামী মানসিকতা। বর্তমান তখনো অন্ধকার, কিন্তু অতীত গরিমার চাকচিক্যে চোখ আমাদের স্বভাবতই ধাঁধিয়ে যেত। উঠতি যুবকের মানসপটে অতীতের সুকর্ণ এক আশ্চর্য

পুরুষ! কিন্তু বর্তমান? সেখানে শুধুই হতাশা, বিভ্রান্তি আর আদর্শহীনতা!

হাজার তিনেক দ্বীপকে সংঘবদ্ধ ক'রে এশিয়ার বুকে আর একটি স্বাধীন দেশের পত্তন করেছিলেন এই মহানায়ক। সংখ্যাতীত ভাষা, ধর্ম; আর কৃষ্টিকে একই সূতোই গেঁথে তুলেছিলেন।

আচ্ছা, পরিবেশের সাথে সাথে মানুষের চরিত্রও কি পাল্টায়? পরাধীন ইন্দোনেশিয়ার নির্যাতিত গণনায়ক স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় বিলাসে-বৈভবে-ভোগে-লালসায় এমন আদর্শ বিমুখ হয়ে পড়লেন কেন?

আজ তাঁর অন্তিম প্রয়াণে বাটাভিয়ার প্রাসাদের উপর দিয়ে বর্ষার হাওয়া হা হা করছে। বিরাগী বাতাসের আশ্চর্য গোঙানি সেই নির্জনতাকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে। একটু দূরের পথ দিয়ে সামরিক কনভয়ের ক্ষিপ্র গতি। রূপ বিলাসী জাকার্তার বুকে নানা রঙের আলোর দাপাদাপি। একটা কঠিন আবেষ্টনীর মধ্যে সামান্যতম দীর্ঘশ্বাস জানিয়ে দেয়ঃ সুকর্ণ আর নেই!

এই প্রাসাদ, এই মনোরম আলোক উজ্জল বাটাভিয়া প্রাসাদে সুকর্ণের আর স্থান ছিল না। যদিও একদিন তিনিই সর্বপ্রথম আজাদী ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ঐ প্রাসাদের শীর্ষে!

মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি ছিলেন নির্বাসিত। মৃত্যু যখন ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে, তখনও তিনি মুক্তির জন্য ছটফট করছেন। প্রিয়তমা পত্নী রত্নশ্রীর হাত চেপে ধরে বার বার অশ্রু সজল হয়ে উঠেছেন। ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছেন তাম্রবর্ণ আকাশের দিকে। সেই সূর্যকে দেখতে দেখতেই তাঁর জীবন দীপ নিভে গেল।

দীর্ঘ চার বছর একটানা নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে অবশেষে চির বিদায় নিলেন সুকর্ণ।··· সামরিক হাঁসপাতালের মেডিকেল বুলেটিনে

প্রচারিত হলো, তাঁর মৃত্যু সংবাদ। সাধারণ মানুষ সেই মুহূর্তে সচকিত হ'য়ে উঠলো। দারুণ এক শূণ্যতায় তাদের বুক হাহাকার করে ওঠে! জেনারেল সুহার্তও বুঝলেন, সাধারণ মানুষের বুকে সুকর্ণ আজও অম্লান। এই ইমেজ নষ্ট হবার নয়! তাই রাষ্ট্রীয় সম্মানও দেখানো হলো মৃত নেতার প্রতি। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে রাখা হলো।

আর আজ যদি সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট থাকতেন, তাঁর মৃত্যুশোকে উদ্বেলিত হয়ে উঠতো তিন হাজার ছোট-বড় দ্বীপের এক নিহারিকা। নিয়তির কী নির্মম কৌতুক! নেমেসিসের কী ভয়ঙ্কর প্রভাব! সুকর্ণের কোন অন্তিম ইচ্ছাই পূর্ণ করেন নি সুহার্ত, শুধুমাত্র রত্নশ্রী দেবীকে কাছে এনে দেওয়া ছাড়া। সুকর্ণ প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তাঁর সমাধি যেন দেওয়া হয় বান্দুংয়ে। বান্দুং তাঁর বড় প্রিয়স্থান, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি তিনি ওখানে কাটিয়েছেন। একটি শান্ত পত্রঘণ নিরালাস্থানে যেন তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়! আর তাঁর সমাধি ফলকে যেন লেখা হয়ঃ

"ইন্দোনেশিয়ার মূক জনগণের মুখে যিনি ভাষা যুগিয়েছিলেন, সেই ভাই কর্ণ এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত।"

একটুকু মিথ্যা নয়। অতিরঞ্জিত নয়!

কিন্তু তা মানতে রাজি হলেন না জবরদস্ত সামরিক প্রশাসক জেনারেল সুহার্ত। সুকর্ণের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হলো না বান্দুংয়ে। নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর জন্মভূমি পূর্ব জাভার ব্লিটারে।

মৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে অজস্র মানুষ অন্ততঃ বারেকের জন্য ফিরে যেতে চেয়েছে অতীতে। এই সেই মানুষ,—যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইন্দোনেশীয় বিপ্লবী জনতাকে। সেই অতীত যুগ

বহ্নিমান আগ্নেয়গিরির মতো,—তার অগ্নিস্রাব সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। এক সময় এ দেশের আয়তন ছিল বিশাল—ফরমোসা থেকে মাদাগাস্কার পর্যন্ত দ্বীপগুলি ছিল তার। এখন অবশ্য এর বিস্তৃতি অনেক সীমাবদ্ধ—সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সেলিবিস ইত্যাদি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়েই আধুনিক ইন্দোনেশিয়া। এখানকার লোকেরা গর্বের সাথে তাদের জন্মভূমিকে বলে থাকে "রত্নদ্বীপ"। পৃথিবীতে এমন সুন্দর ও ঐশ্বর্যশালী দ্বীপময় দেশ আর দ্বিতীয়টি নেই!

জাভাই ইন্দোনেশিয়ার প্রাণকেন্দ্র। জাভাই দেশের অর্থনৈতিক মূল বনিয়াদ রচনা করে আছে। অবশ্য সুমাত্রার তৈলসম্ভারও উপেক্ষণীয় নয়।

বর্তমান শতকের চল্লিশ দশক অবধি ইন্দোনেশিয়ার কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছিল না। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান এখানে। বালি দ্বীপে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য। অন্য সমস্ত দ্বীপে ইসলামেরই প্রভাব বেশী। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় দশটি প্রাদেশিক ভাষা চালু আছে। তবে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে Laag Malicisch ভাষা।

জাভা দ্বীপই সবচেয়ে বিস্তৃত—জনবসতির ঘনত্ব এখানে স্পর্ধিত,—প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫২০·৬৩ জন। তারপরই বালি দ্বীপ। ডাচরা ইন্দোনেশিয়া অধিকার করে নেবার পর জাভাকে প্রায় সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করে। এখানকার উৎপাদিত প্রচুর রবার, চিনি সিংকোনা, পেট্রোলিয়াম, ম্যাংগানিজ ও টিন নিয়ে ওলন্দাজরা বিশ্ববাজারে প্রচুর মুনাফা লুটেছে। তার উপর আছে মসলা, —এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গের শান্তিকুঞ্জ। এই মশলার লোভেই প্রথমে পর্তুগীজ ও পরে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ওলন্দাজরা এখানে আস্তানা গেড়ে বসে।

ইন্দোনেশিয়া তা জাতীয় আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা পেয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে। ভারতের গান্ধী, সুভাষ, রবীন্দ্রনাথকে ইন্দোনেশীয় জনগণ শ্রদ্ধা করে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন বিপ্লবী ইন্দোনেশিয়ায় একটি 'শিক্ষা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন জাভাতে। বর্তমান জাভার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র এটি।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সংগীত, নৃত্য-কলা চর্চা, সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষার আকর্ষণীয় বিদ্যাপীঠ এটি।

আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার গণ-বিপ্লবে একজন শিক্ষাব্রতীর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। তিনি হলেন কী হাজদার। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী তিনি প্রচার করতে থাকেন। ১৯১৩ সালে ডাচ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁকে ইন্দোনেশিয়া ত্যাগে বাধ্য করেন।

হাজদার হল্যাণ্ডে গিয়ে তার কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর আদর্শে সংগঠিত 'আমন শিষ্য'রা ইন্দোনেশিয়ার সংগ্রামে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ইন্দোনেশিয়ায় পরে লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কী হাজদার এর শিক্ষামন্ত্রীর পদটি গ্রহণ করেন।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রাকৃতিক দান অফুরন্ত বলা চলে। বিশ্বের প্রয়োজনীয় মসলার বিরানব্বুই ভাগই সে যোগায়। সিংকোনা যোগায় শতকরা নব্বুই ভাগ। অকসাইট এ্যালুমিনিয়াম ও লোহার ভাণ্ডারও অফুরন্ত। বিশ্বের শতকরা ৭৭ ভাগ ক্যাপক, ১৯ ভাগ চা, ২৯ ভাগ কোকো, ২০ ভাগ টিন, ৩১ ভাগ নারিকেল শাঁস, ৫ ভাগ চিনি ও ২৫ ভাগ পেট্রোলিয়ামের যোগান দিচ্ছে এই দ্বীপময় দেশ।

কিন্তু এত সমৃদ্ধির রাজত্বে বাস করেও ইন্দোনেশিয়ার জনগণ কোনদিন প্রাচুর্যের ও শান্তির সন্ধান পায় নি। ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শোষণ করেছে চূড়ান্ত, আবার সুকর্ণের খাম খেয়ালিপনায় তারা বছরের পর বছর নিপীড়িত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণে ইন্দোনেশিয়ার জনগণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। ডাচরা শ্রমিক ও চাষীদের দৈনিক মজুরী দিত তিন আনা থেকে ছয় আনা মাত্র। এমন নিম্নহারে মজুরী বিশ্বের আর কোথাও দেওয়া হয় কিনা জানা নেই। দেশের রাজস্বের শতকরা তিন ভাগেরও কম জাতির স্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়িত হতো। সাতকোটি লোকের জন্য পাঁচশ হাসপাতালে ছিল মাত্র তেষট্টী হাজার বেড। প্রতি ষোল হাজার ইন্দোনেশিয়ানদের জন্য থাকতেন একজন করে ডাক্তার। এখানে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ২১ জন!

নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ তার ভয়াল রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে ইন্দোনেশিয়ার বুকে। ওলন্দাজদের বেনিয়া নীতির শোষণ যন্ত্র মানবতাকে হত্যা করেছে ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে। কোণঠাসা আইনের কবলে পড়ে পড়ে কেবলই মার খেয়েছে দেশের লোকেরা। পৃথিবীর শান্তি ও প্রগতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্ত চিরকালের। অর্থনৈতিক সাম্য এবং মুক্তিকামী জাতির বলিষ্ঠতা তার দু'চোখের বিষ।

বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের নোংরামিতে সে ভরপূর; এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচার ও চক্রান্ত মানুষের প্রবাহমান ইতিহাসের কতকগুলি মসীলিপ্ত অধ্যায় মাত্র।

আজ সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সংগ্রামী জাতিগুলি। পুরানো ও নয়া,—উভয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই তাদের এই জেহাদ। ইউরোপীয় ও মার্কিন সততায় বিশ্বের প্রতিটি সংগ্রামী মানুষ স্বভাবতই আজ সংশয়ী। সাম্রাজ্যবাদীরাই তো দু' দুটো মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী। আর ওদের প্রতিটি শান্তির বাণীকেই নিছক আপ্তবাক্য বলে মনে হয়। মিথ্যা আর ধাপ্পাবাজিতে তারা প্রত্যেকেই এক একটি হিটলার,—যেন রাইকষ্টাগে আগুন ধরিয়ে সাম্যবাদীদের কুৎসা গাইছে। ওদের

তথাকথিত গণতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে ফ্র্যাংকেষ্টাইনের আবির্ভাবের গুপ্ত বীজ।...

ওলন্দাজরা চেয়েছিল, ইন্দোনেশিয়াকে তারা চিরকাল এক অছি অঞ্চল বানিয়ে রাখবে। এর জন্য যত রকমের কদর্যতার প্রয়োজন, তারা তা করবে। ডাচ গোয়েন্দা বিভাগ ছিল ব্যাপক ও অতন্দ্র। অবাধে গুলি চালানো ও গ্রেপ্তারের পূর্ণ অধিকার ছিল প্রতিটি ডাচ গোয়েন্দার। দেশ প্রেমিকদের তারা খুঁজে বেড়াতো বিভিন্ন সভা সমিতিতে, কারখানায়, লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে। যাকেই তারা অপরাধী মনে করতো, তাকেই হয় মৃত্যুদণ্ড না হয় নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নিতে হতো। এর জন্য কোন বিচারের প্রয়োজন ছিল না।

আইনের কাছে কোন সমতা ও নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করা ছিল বাতুলতা। ইউরোপীয়ানদের জন্য একরকম আইন, ইন্দোনেশীদের জন্য অন্য রকম।

ডাচ সরকারের বন্দী শিবির গড়ে উঠলো নিউগিনির ডেলো নদীর উজান মুখে অনামারায় ও তানাদিতে। নদীর কালো জলের উপর গড়ে ওঠা সে এক বীভৎস বন্দীশালা। নাৎসীদের Concentration Campও এর চেয়ে মানবিক। বাস্তিলও এর কাছে দাঁড়াতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদিক অহমিকা এখানে পুঞ্জীভূত। যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরা সেখানে একবার নিক্ষিপ্ত হতেন, তাঁরা আর প্রায় ফিরে আসতেন না। হয় পাগল হয়ে যেতেন, না হয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে চিরদিনের মতো প্রাণশক্তি হারাতেন। এই দুটি বন্দীশিবিরের দুর্দশা দেখে সুকর্ণ চোখের জল ধরে রাখতে পারেন নি এক সময়। আবেগে বলে উঠেছিলেন, 'এমন শাসনে বেঁচে থাকার চাইতে নরকে যাওয়া শ্রেয়।'

সাগর সন্তান শতধা বিভক্ত ইন্দোনেশিয়া তখন সমুদ্র-কল্লোলের

মধ্যেই তার মুক্তিগান শুনবার চেষ্টা করছে। অঢেল সম্পদ, যদিও মানুষ এখানে পেট পুরে খেতে পায় না। কখনো অমাবস্যা, কখনো কাকজ্যোৎস্না। লালমুখো ফিরিঙ্গীদের সদম্ভ আনাগোনা। ইন্দোনেশীয় নারী লজ্জায় মুখ লুকায়। সবুজ গাছ গাছালির ঠাসবুনুনি, ওরই মধ্যে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ী এখানে সেখানে। বাংলা দেশের মতো সোঁদা সোঁদা গন্ধ এখানেও ঘ্রাণ নেওয়া যায়। আধো আলো আধো অন্ধকারে সরল মুখগুলি উকি ঝুঁকি মারে, দমকা বাতাসের মতো ডাচদের অত্যাচার যেন চড়াৎ করে থাবা মারে ওদের সরলতার উপর।

ইন্দোনেশিয়ার এমন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলির সামনে প্রথম যিনি মুক্তির কথা শোনালেন, তিনি এক চওড়া বুক সরকারী ডাক্তার। ডঃ সুটোমো। মানুষ তো নন, যেন পয়গম্বর। ভরাট গলায় দরদ দিয়ে কথা বলেন। আর সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যখন আক্রমণ শানান, তখন তো মনে হয়, ভিসুভিয়সের অগ্নুৎপাৎ চলেছে!

ড: সুটোমো স্বপ্ন দেখালেন, ইন্দোনেশিয়া একদিন স্বাধীন হবে! কিন্তু স্বাধীনতা তো হাতের মোয়া নয়। যোদ্ধা কোথায়? ইন্দোনেশিয়ার সন্তানরা তখনো সংগ্রাম কাকে বলে জানে না! স্বাধীনতার যোদ্ধারা তখনো তৈরী হয় নি! আগে অশিক্ষা, কুসংস্কার, ও অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে জাতীয় চেতনাকে শানিয়ে নিতে হবে। এই শাণিত গণমানস তখন সহজেই স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে।

ডঃ সুটোমোর নেতৃত্বেই ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম গণ জাগরণের সূত্রপাত। প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯০৮ সালে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'Boedi Octomo'। বোয়েডী অক্টোমো রাজনৈতিক ভূমিকায় অনেকটা ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের মতো। কংগ্রেসেরই মতো এর প্রারম্ভিক দায়িত্ব ছিল, মধ্যবিত্তদের হয়ে

নরম সুরে বক্তব্য রাখা, সরকার বাহাদুরের কাছে বিনীত আর্জি পেশ করা। এই দলের প্রধান শ্লোগান ছিলঃ অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে হবে! দেশে উচ্চ শিক্ষা চালু করতে হবে!

১৯১০ সালে আর একটি রাজনৈতিক দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। নাম, শারেকাত-ই ইসলাম [Sareket-i-Islam]। চরিত্রে এই দলটি ভারতের মুসলীম লীগের সাথে তুলনীয়। ধর্মের জিগির তুলেই দেশবাসীকে এক করতে চায়!

সুর নরম হোক, আর গরম হোক, ডাচ সরকার ইন্দোনেশিয়দের কোন প্রতিষ্ঠানকেই মাথা উঁচিয়ে চলতে দিতে রাজি নয়। তাই দু'দলের কর্মীদেরই উপর শুরু হলো অকথ্য অত্যাচার। ডাচদের অত্যাচার যত বেড়ে যায়, মুক্তিকামীদের আন্দোলন ততোই জোরদার হয়ে ওঠে।

সময়টা তখন নতুন ও বিরাট সম্ভাবনা সম্পন্ন। রাশিয়ার বুকে আছড়ে পড়েছে বলশেভিক বিপ্লব। তামাম দুনিয়া আনন্দে-বিস্ময়ে, ভয়ে-বিহ্বলতায় একশার। সে আগুনের সামনে বসে সাম্রাজ্যবাদীদের সর্বাঙ্গে, মাংসে, রক্তে, হাড়ে, মজ্জায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে দারুণ জ্বালা! আর সেই বহ্নিও সঞ্জীবনী শক্তি হয়ে এলো নিপীড়িত জাতিগুলির কাছে।

সেই বিপ্লবের তপ্ততায় নতুন উপলব্ধি নিয়ে ১৯১৭ সালে শারেকাত-ই-ইসলাম সর্বপ্রথম সাহস ভরে ঘোষণা করলো:

"আমরা ডাচদের শৃঙ্খল চূর্ণ করতে চাই। চাই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা।"

সংঘবদ্ধ হচ্ছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। মার্কসবাদ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসের মতো। সাধারণ মানুষ ক্রমশই সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যুগকে ধরতে পেরে তারা মারমুখী হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। বিদেশী শোষণের প্রধান স্থান চিনির কারখানাগুলিতে

ধর্মঘট চলতে থাকে দিনের পর দিন।

কমিউনিষ্ট পার্টির জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন অসম্ভব বেড়ে চলে। নিরন্ন মানুষগুলি এতদিনে তাদের আদর্শের সন্ধান পেলো। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে বার বার আঘাত হানতে থাকে। আর সাম্রাজ্যবাদীরা এর প্রত্যুত্তর দিতে দিনের পর দিন শ্বাপদের মতো খল ও হিংস্র হ'য়ে উঠেছে। শ্রমিক নেতাদের ধরে ধরে প্রচণ্ড মার দেওয়া হয়,— মারে অনেকে চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যায়, গুলিতে প্রাণ দিলো কত, কয়েদখানায় পচে মরলো হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ! মিটিং, শোভাযাত্রা ও পিকেটিং—সমস্ত কিছুই নিষেধ।

১৯২৬ সাল।

জাভা ও সুমাত্রায় বিপ্লবীরা চালু করলো বয়কট আন্দোলন। সমস্ত রকম বিদেশী দ্রব্য বয়কট করছে স্থানীয় লোকেরা। স্বদেশী শিল্পে প্রাণ এলো। আর বিদেশী বেনিয়ারা চোখে দেখলো অন্ধকার।

নিউগিনির কুখ্যাত জেলগুলিতে আর তিল ধারনের স্থান নেই। আরো নতুন নতুন বন্দীশিবির গড়তে হলো বিপ্লবীদের আটকে রাখবার জন্য। মৃত্যুদণ্ডও হয়েছিল কয়েকজন শহীদের।

সারাটা দেশ জ্বলছে। পথে পথে চলেছে জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ। চলেছে একটানা ধর্মঘট! কমিউনিষ্টরা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে গ্রামে। প্রচার করছে বিপ্লবের বাণী। দ্বীপে দ্বীপে পায়তাড়া কষছে আগামী গেরিলা যুদ্ধের জন্য।

সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, ১৯২৭ এ, ইন্দোনেশিয়ায় জন্ম নিলো আর একটি রাজনৈতিক দল। জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশিয়া সংসদ। নেতা দু'জন উচ্চশিক্ষিত তরুণ,—ডঃ সুকর্ণ এবং মহম্মদ হাতা।

এই দু'জনের উপর বিষ দৃষ্টিতে তাকালো ডাচেরা। দু'জনকেই

পাকড়াও করা হলো। কাজীর বিচারে হলো তাঁদের নির্বাসন দণ্ড।

কিন্তু জনতা তা মানতে রাজি নয়। দেশ জুড়ে আগুন জ্বলে উঠলো। সুকর্ণের মুক্তি চাই! সুকর্ণ জাতির জনক। সুকর্ণ জাভার গান্ধী! তাঁর অগ্নিসুদ্ধ বক্তৃতা মানুষের বুকের রক্ত উত্তাল করে। হাজার হাজার বৈপ্লবিক স্ফুলিঙ্গ যেন বার বার স্ফুরিত হয় তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে।...

ঘন ঘন কারারুদ্ধ হচ্ছেন সুকর্ণ। অকথ্য অত্যাচার চলেছে তার শরীরের উপর। কিন্তু ইস্পাতের মতো অনমনীয় গণনেতা। অসাধারণ কর্মশক্তি আর প্রাণ প্রাচুর্য! আর তাঁর পাশে ডঃ মহম্মদ হাতা শ্রেষ্ঠ সহযোদ্ধা!

সুকর্ণ আর হাতার কথা বাদ দিলে আরও একজন ইন্দোনেশীয় নেতার নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি ডঃ আমীর সরিফুদ্দিন। সরিফুদ্দিন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য। সর্বহারাদের বিপ্লবের মন্ত্রে এক করাই তাঁর স্বপ্ন!

এই তিন নেতার নেতৃত্বে গণদেবতা জেগে উঠলেন। সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে আজাদী সংগ্রাম শতাব্দী সঞ্চিত জঞ্জাল ঠেলে ভাস্বর হয়ে উঠলো।...

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫।

দ্বিতীয় মহাসমরে ইন্দোনেশিয়া আর এক বীভৎস অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলো। পার্ল হারবারকে খতম করে জাপ সাম্রাজ্যবাদ তার নখর আক্রমণ বিস্তারিত করলো দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দিকে। ডাচরা জাপানীদের কাছে এক টিপ নস্যি মাত্র। সাধ্য কী ওদের জাপানী অগ্রগতিতে রুখতে পারে! স্বল্প আক্রমণেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে একেবারে বেপাত্তা!

ওলন্দাজদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে ইন্দোনেশিয়া এখন হলো

জাপানের রক্ষিতা। আর জাপ সাম্রাজ্যবাদ আরো পাশব, আরো জঘণ্য। শুরু হলো ব্যাপক হত্যা, ষড়যন্ত্র, - আত্মবিক্রয়, নারী-ধর্ষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদি।

নোনাপানির দেশ রক্তে ভেসে চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক কোন বুভুক্ষু অতিকায় প্রাণীর মতো তিন হাজার দ্বীপকে জঠরে স্থান দিয়েছে জাপান। সেই জঠর ছিঁড়ে দেশকে বের করে আনবার শপথ নিলেন সেই কমিউনিষ্ট নেতা ডঃ আমীর সরিফুদ্দিন। গেরিলা বাহিনী গড়ে তুললেন তিনি। শুরু হলো নতুন ধরণের সংগ্রাম। সহিংস সংগ্রাম। রক্ত না ঝরলে মুক্তি আসে না। নিরক্ত মুক্তিতে আছে অনেক বুজরুকি ও দুর্বলতা।

ইতিহাসের দুর্ভাগ্য।

১৯৪৩ এ' ডঃ আমীর সরিফুদ্দিন ধরা পড়ে গেলেন জাপ চমূদের হাতে। সঙ্গে তাঁর চুয়ান্ন জন সাহসী সহকর্মীও। অমানুষিক অত্যাচার হয় আমীর সরিফুদ্দিনের দেহ ও মনের উপর! কুখ্যাত জাপানী শাস্তি 'জল চিকিৎসা'ও চালানো হয় তাঁর উপর।

১৯৪৫ সালের ১লা অক্টোবর যখন সরিফুদ্দিন ছাড়া পেলেন, তখন শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে! একটানা অত্যাচারে সাক্ষী তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ!

জাপানীদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশীয়দের বিরাট সংগ্রাম দেখে উল্লসীত বোধ করে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ। London Times তো গদ গদ হয়ে মন্তব্য করলে ঃ

"ইন্দোনেশিয়া একজনও কুইসলিংয়ের জন্ম দেয় নি!"

তারপর—

তারপর ১৯৪৫ সাল।

আধুনিক সভ্যতার লজ্জাকর পরিণতি। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ফাটলো এ্যাটম বোমা। মানবিকতা অন্তর্জালায় মুখ ঢাকলো। কেঁদে

উঠলো আগামী বংশধরের দল। রুধিরাপ্লুত জাপান হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে,—উঠে দাঁড়াবার শক্তি তার নেই!

আনন্দে উল্লাসে উদ্দাম হ'য়ে উঠলো ইন্দোনেশিয়া।

তার তুই শত্রু,—ডাচ ও জাপানীরা সরে দাঁড়িয়েছে। এই তো স্বাধীনতা ঘোষণার সুবর্ণ সুযোগ!

জাকার্তায় স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলো।

স্বাধীনতার পতাকা উড়লো প্রতিটি উঁচু প্রাকারে, ঘোষিত হলোঃ "ইন্দোনেশিয়ার সরকার জণগণের স্বাধীন সরকার!"

"স্বাধীনতা প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার! পররাষ্ট্রের অধীনতা মানেই মানবতাকে বিসর্জন দেওয়া। এই পরাধীনতা দূর করতেই হবে!"

কিন্তু সংগ্রামের তখনো অনেক বাকি।

সাম্রাজ্যবাদীরা একে অপরের ভাই ভাই, বিশেষতঃ, সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগে তারা এক যৌথ প্রাচীর গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

তাই ইন্দোনেশিয়ার বুকে ডাচরা যখন হালে পানি পাচ্ছে না, তখন তার স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এলো পালের গোদা বৃটিশ। বৃটিশও ডাচ সৈন্যরা নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধাদের! ডঃ সুকর্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ ভাষণে সাম্রাজ্যবাদের এই কলংকিত চরিত্র তুলে ধরেন সমগ্র বিশ্বের সামনে।

বৃটিশের এই নোংরা অভিযানে পরিচালিত হয়েছিল হাজার হাজার গুর্খা, জাপানী ও ডাচ সৈন্যরা।

কিন্তু গেরিলাবাহিনীর আশ্চর্য গণ-যুদ্ধে প্রতিহত হলো সেই সাম্রাজ্যবাদী অভিযান। ইন্দোনেশিয়ানরা একটির পর একটি ঘাঁটি অধিকার করে নেয়,—ইংরাজ সেনাদের পর্যুদস্ত ক'রে একটির পর একটি দ্বীপ তারা আবার অধিকার করে নেয়।

এইভাবে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ রক্তাক্ত সংগ্রামের

মধ্য দিয়ে আজাদী ইন্দোনেশিয়ার জন্ম হয়েছে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ মুক্তিকামী জনতার প্রচণ্ড শক্তি ও সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করলেন :

"আগামী ইতিহাসে যে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হামলাবাজি করতে এলে চূড়ান্ত মার খেয়ে যাবে! আমাদের প্রতিরোধ শক্তির কোন সীমা নেই!" সেই গৌরব ভাস্বর অতীতের সাথে আজকের কোন তুলনাই হয় না। সেদিনের গণ-সম্বর্ধিত জাতির কর্ণধার, আজ নিতান্তই অবজ্ঞা ও দুর্দশার মধ্যে ধীরে ধীরে নিভে গেলেন। জীবনের জীবনের শেষ বাঁকমুখে প্রবেশ করে সুকর্ণ তাঁর অতীতকে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর সংগ্রামী চেতনায় মরচে জমতে থাকে ধীরে ধীরে। কামিনি ও কাঞ্চনে মেতে উঠলেন মধ্যযুগীয় কোন উচ্ছৃঙ্খল রাজার মতোই। সাধারণের মুখের দিকে তাকাবার আর ফুরসৎ নেই! তাই ইতিহাসের ক্ষমা তিনি পাবেন কেন?

১৯৬৫ তে সুকর্ণ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল, সুন্দরীদের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে বুকের মধ্যে অনুভব করলেন দারুণ যন্ত্রণা।

সুকর্ণ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

ছুটে এলেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। চীনা ডাক্তার! ঝানু লোক! কী যেন ভাবতে ভাবতে সুকর্ণের বা হাতখানা তুলে নিলেন। কপাল ও মুখের বলিরেখাগুলি হঠাৎ তাঁর সংবদ্ধ হয়ে আসে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেডিক্যাল বুলেটিন প্রচারিত হলো বাটাভিয়ার প্রাসাদ থেকে : Days of our beloved President are numbered with in a week or a brief period he is sure to meet his death."

"আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রপতির দিন ঘনায়মান। ··এক সপ্তাহ বা, আরো কম সময়ের মধ্যে মৃত্যু তাঁর অবধারিত !···"

ভাই কর্ণ মারা যাচ্ছেন !

সমস্ত দেশ জুড়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। উল্কা পাত্র আর বজ্রপাত যেন ঘটলো অজস্র। সবুজ ইন্দোনেশিয়ায় কারা যেন রক্তে ফুটকি এঁকে গেল কতকগুলি !

প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান !

ইন্দোনেশিয়ার দুটি শিবিরই এই মুহূর্তে দারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে, —বামপন্থী কমিউনিস্টরা আর দক্ষিণপন্থী লোকেরা ! কমিউনিষ্ট নেতা পার্তাই কোমুসি পিকিংয়ের দিকে ব্যাগ্রদৃষ্টিতে তাকান। সেখান থেকে ইথারে ভেসে এলো সেই বিশেষ শব্দগুচ্ছ : বিপ্লব !! রক্তাক্ত বিপ্লব ! ··· বিপ্লব ! শ্রেণীহীনদের বিপ্লব !! ...

এর পরের ইতিহাস সকলেই জানে। বিপ্লবীদের এতবড় বিপর্যয় বিশ্ব ইতিহাসে তুলনাবিহীন। দক্ষিণপন্থীরা সাহায্য পেলো মার্কিন সমর্থন পুষ্ট সেনাবাহিনীর।

বিপ্লবকে হঠাৎ আমদানী করতে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ার অনেক সম্ভাবনাকেই হত্যা করে বসলো ওখানকার কমিউনিষ্ট পার্টি। একজন সাম্যবাদীও রেহাই পেলো না। সামরিক পেষণে শেষ হয়ে গেল বিপ্লবের স্বপ্ন। রক্তের সাগরে ডুবে গেল ইন্দোনেশিয়া। লিষ্ট ধরে প্রত্যেক বিপ্লবীকে গুলি করে মারা হয়। বনে-জঙ্গলে পালিয়েও তারা প্রাণ বাঁচাতে পারলো না। সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যায় স্তম্ভিত বিশ্ব,—প্রায় চল্লিশ লাখ তরুণ প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছে অকালে বিপ্লবের ভ্রূণকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার ব্যর্থ প্রয়াসে !

সমর কর্তারা কিন্তু সুকর্ণকেও সুনজরে দেখলেন না! এই লোকটা তো প্রচ্ছন্ন কমিউনিষ্ট! চীনের কাছে উৎসাহ পেয়ে সমানে মদত দিয়ে এসেছেন কমিউনিস্ট পার্টিকে!

কোনঠাসা করে রাখা হলো প্রেসিডেন্টকে। নজর বন্দী হলেন তাঁর প্রাসাদে। অস্তাচলে গেল তাঁর গৌরব রবি। আর তিনি সেই 'আজীবন রাস্ট্র নায়ক' নন। আরো করুণ ব্যাপার, মৃত্যু এসে তাঁকে নিস্তার দিলে না! চৈনিক ডাক্তারের সেই ডাক্তারি ব্যাখ্যাতেই তো এত সব অনর্থের উৎপত্তি। কিন্তু মরণ কোথায়? তিল তিল করে জ্বলছেন সুকর্ণ, অথচ হৃদযন্ত্রটি ঠিকই দম দেওয়া ঘড়ির মতো টিক টিক করে চলেছে।...

সেই ভাই কর্ণ এতদিনে মরলেন।

বিংশ শতাব্দীর রাজনীতিতে এ যেন মস্ত নাটক!

সোলেমান, এ দেশে বর্ষা এসেছে। নদী জপমালা ফুলে ফেঁপে একসার। নামছে ঢল। আসছে আবার বন্যা। প্রতি বৎসর বন্যা যেন অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে কাজে না লাগাতে পারার ফলশ্রুতি এটা। অথবা, সরকারী প্রয়াস থাকলেও, আমাদের চরিত্রহীনতার জন্য কখনোই তা বাস্তবায়িত হয়ে উঠছে না।

ভারতবর্ষ এখন শিল্পযুগে পদক্ষেপ করেছে। অথচ, শিল্পে এখন যা সংকট দেখা দিয়েছে, তাতে তো মনে হয় এ দেশের অর্থনীতিতে নাভিশ্বাস উঠতে আর বেশী দেরী নেই। প্রায় প্রতিটি শিল্প সংস্থা মার খাচ্ছে। ক্ষতির বহর আকাশ প্রমাণ,—একাধিক কারখানায় তালা ঝুলছে।

কারণ জিজ্ঞেস করলেই সেই এক উত্তর: শ্রমিক-অশান্তি,

ওদের কাজে অনীহা... ক্রমাগত শ্রমিকদের চাহিদা... ইত্যাদি ইত্যাদি!

এ সব উত্তরে আমরা খুশী নই। এ যুক্তি ধোপে টেকে না। বরং কর্তা ব্যক্তিদের চরিত্রহীনতাই এর জন্য সবচেয়ে দায়ী!

অল্প কিছুদিন আগের কথা। আমি বর্ধমান থেকে ট্রেন যোগে হাওড়া যাচ্ছিলাম। ট্রেনে একজন শ্রমিকের সাথে আলাপ হলো বাংলা দেশের এক অতিবৃহৎ সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মী সে। ইদানীং সেখানে দারুন গণ্ডগোল,—লক আউটের খড়গ ঝুলছে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

ওর নিজের কথায়:

"হালারা সব চোর! যারা সব কত্তা হইয়া আছেন, সবাই পুকুর চুরিতে হাত পাকান!"

এই তো ব্যাপার! বাজে কাঁচা মাল ক্রয়, মূল্যবান জিনিসপত্র চোরাই পথে বিক্রী, টাকা খেয়ে টেণ্ডার গ্রহণ না করে কোন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ দান,—সর্ব্বস্তর চোরাফাঁদে পড়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশই ডুবে যাচ্ছে! আর সেই কর্তা ব্যক্তিরাই তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে:

"ক্ষতি তো হবেই! শ্রমিক অশান্তি, ওদের কাজে অনীহা,··· ক্রমাগত অন্যায় চাহিদা···ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

আজ এখানেই ইতি টানছি। আগামী সপ্তাহেই ফিরে যাচ্ছি ব্যাঙ্গালোরে। ক'দিন বেশ কাটলো। দিনগুলি যে কীভাবে কেটে গেল, টের পাইনি!

বাধন হারা অনুভূতি! বয়েস ও কালের গণ্ডী পেরিয়ে সবুজ হয়ে উঠেছে মন। জানি না, এমন আবেগ কতদিন ধরে রাখতে পারবো।

প্রীতিসহ

সেনগুপ্ত।

প্রিয় সেনগুপ্ত,

একগুচ্ছ ডিপ্লোম্যাটিক লেটারের মধ্যে একমাত্র তোমার বার্তা আমার মনে অন্তরঙ্গতার প্রলেপ দেয়। আল্লাকে ধন্যবাদ, আমরা হঠাৎ এক অদৃশ্য যোগসূত্রে পরস্পরের ঘনিষ্ট হতে পেরেছি।

আমি এ চিঠি লিখছি জাহাজে চেপে। হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে যেতে হচ্ছে পোর্ট সৈয়দে। আমি বিমানের চেয়ে অর্ণবপোতকেই পছন্দ বেশী করি। সমুদ্র আমার প্রিয়া, আমার আফ্রোদিতি! কবে যেন জলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, আর স্থলের মোহ আমাকে আটকে রাখতে পারে না। সমুদ্রের বুকে শরীরের সাথে সাথে মনও দোলে। বস্তু জগতের কঠিন চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় মন। নিজেকে মনে হয় প্রেম-আকুল হতভাগ্য রোমীয় সেনাপতি মার্ক এ্যান্টনি! প্রেমের অন্ধতায় বুঝতে পারছে না, ক্লিয়োপেট্রা তার সাথে নিছক ভালবাসার অভিনয় করে চলেছে! বুঝতে পারছে না, তার সর্বনাশ ঘনায়মান! শুধুই ভেসে যাচ্ছে সিডিনাস নদীর বুকে, আলোর মালা দিয়ে সাজানো প্রমোদ তরণী দোল খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে কোন এক অনিশ্চিত পরিণতির দিকে। শুধু এ্যান্টনির

বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে একটি মাত্র সত্বাই জ্বল জ্বল করছে, এবং তা হলো তার ভেনাস ক্লিয়োপেট্রা! সেই অর্ধনগ্ন অর্ধ শায়িত নিখুঁত তনুদেহ, অঙ্গে অঙ্গে সুষমিত কামনার হাতছানি...

প্রিয়বরেষু, জীবনে নারীকে কামনা করেছি। কিন্তু পাই নি। আমার কল্পলোকের আফ্রোদিতির সাথে পরিচিত হই, সঙ্গও লাভ করি! কিন্তু সেই মানসীকে খুঁজে পাচ্ছি না।

অনেক দিন আগের এক ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি তখন আলেকজেন্দ্রিয়া বিশবিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাদের এক অধ্যাপক রসুনউল্লা সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সেখানে অধ্যাপক তনয়া নাজিরাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। আপন মনে গান গাইছিল। আর সবচেয়ে আকর্ষক ওর চোখ দুটো। সম্ভবতঃ নাজিরার মোহেই আমি প্রায়ই প্রোফেসর রসুনল্লার বাড়ীতে যাতায়াত শুরু করে দিলাম। সপ্তাহে অন্তত দু'বার। আকাশের রঙ তখন আমার কাছে পাল্টে গেছে, বাতাসে ঘ্রাণ পাই ইরানী গোলাপের।... একদিন সাহস করে এগিয়ে গেলাম নাজিরার কাছে। বুকের সবটুকু সাহস একত্রিত করে বললাম, "আপনার চোখ দুটো ভারী সুন্দর!"

মেয়েটি ভীষণ চমকে উঠলো! কেমন যেন একটা বোবা কান্নায় ওর ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠে, সে বললো, "আপনি আমার অন্ধত্বকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন!"

আমার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। এত বড় আঘাত এর আগে আমি কখনো পাই নি। চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হলো! নাজিরা অন্ধ! খোদাতাল্লার কী করুণ রসিকতা! এমন দুটি বিচিত্র সুন্দর আঁখিতে তিনি দৃষ্টিশক্তি দেন নি!...

আমি একা।

সেনগুপ্ত, আমার এই একাকীত্ব সময় সময় বড় ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে। যাদের সাথে মেলামেশা করি, কাজ কারবার চালাতে হয়, তারা প্রায় সবাই কৃত্রিম, মেকানিক্যাল! প্রাণের স্পন্দন বড় কম, যা বলে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বলে, সেই সব কথা সব সময়ই স্পষ্ট ও সরল অর্থ বহ হয়ে ওঠেনা, আমাদের সেই সমস্ত উক্তি নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষা চালাতে হয়. কূটনৈতিক জগতে আমরা বাস্তবিক বন্ধুহীন, প্রাণহীন বাঁধাধরা জীবনে ঘুরপাক খাচ্ছি। তাই মাঝে মাঝে তোমার চিঠি পেলে নতুন আনন্দে মন ভরে ওঠে। স্বাধীন ও স্বচ্ছ ভাবনার জগতে ফিরে যাবার সুযোগ পাই।

ইদানীং আমার মনে উৎসাহের বিশেষ ভাটা পড়েছে। আমি বড় ভাবতে শুরু করেছি। আগে ভাবতাম কম, কাজ করতাম বেশী। এখন ভাবনাটাই বড় হয়ে উঠছে, কাজে আর মন বসে না। কোন একটা সাধারণ কাজেও বৈরাগ্য এসে ভর করে! মনে হয়, সবটাই অর্থহীন!···রাসেল এবং ডঃ রাধাকৃষ্ণণের বইগুলি ইদানীং আমার পাথেয় হয়ে উঠেছে। ইহুদি মেনুহিন বা বিটকেলের সাঙ্গীতিক মূর্চ্ছনা শুনতে বড় ভালো লাগে! আর শান্তির প্রলেপ দেয় তোমার অন্তরঙ্গ চিঠিগুলি।

তবু রাজনীতি আর রণনীতির অক্টোপাশ বাঁধনকে ছিন্ন করবার ক্ষমতা আমার নেই,—এটা আমার জীবনে অত্যন্ত deep rootedly conditioned হয়ে আছে। শুধু জন্মভূমি মিশর নয়, আফ্রিকার প্রতিটি সংগ্রামী জাতির স্বার্থ দেখবার জন্যই আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকাকে হয়তো আরো দু'এক দশক ধরে লড়তে হবে। বিশেষতঃ সবচেয়ে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পর্তুগাল সবচেয়ে হিংস্র ও খুনী, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নেও মধ্যযুগীয় পাশবিক অত্যাচারে তার বন্য আনন্দ।

সনাতনী আফ্রিকার বিরাট অংশ জুড়ে আজো পর্তুগীজদের সীমাহীন অত্যাচার চলেছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিয়ানা, কেপভার্ডো দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরা সবাই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের বলি। ভাস্কো ডা গামা আর নাবিক হেনরীর দুঃসাহসিক বংশধররা এখনও অতীতটাকে পুরোপুরি কায়েম রেখেছে। অথচ, এই সমস্ত অধিকৃত রাজ্যগুলির সম্মিলিত এলাকা কতখানি জানো? মূল পর্তুগালের চেয়ে প্রায় তেইশগুণ বড়। এদের মধ্যে এ্যাঙ্গোলা আর মোজাম্বিক আমাদের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হ'য়ে রক্তসূর্যের মতো জ্বলছে। কঙ্গোয় দাস ব্যবসাকে পুরোপুরি তুঙ্গে তুলে রাখবার জন্য অতীতে পর্তুগীজরা এ্যাঙ্গোলায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বন জঙ্গল আর স্যাঁৎসেতে জমির এই দেশ তেমন কোন অনুরণন তোলেনি পর্তুগীজদের মনে। গুরুত্ব বাড়লো ১৫৭৬ সালে, যেবার এ্যাঙ্গোলার বুকে গড়ে উঠলো এক নতুন বন্দর,—লুয়াণ্ডা যার নাম! লিসবন বুঝলেন, এ্যাঙ্গোলাকে আর কখনো হাতছাড়া করা উচিত হবে না, দেশটির ভবিষ্যৎ স্বর্ণপ্রসূ। পর্তুগীজ অধিকৃত কঙ্গোর গুরুত্ব যত কমতে থাকে, এ্যাঙ্গোলার আকর্ষণও তত বাড়তে থাকে। এ্যাঙ্গোলার হাজার হাজার উপজাতি প্রধানদের বিরুদ্ধে শুরু হলো পর্তুগীজদের চক্র চক্রান্ত। এ্যাঙ্গোলায় কোন শক্তিশালী উপজাতি সর্দার ছিলেন না। তবু দীর্ঘ তিন শ' বছর ধরে ছোট খাটো যুদ্ধ ও দাঙ্গায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে লিসবন সরকারকে এই দেশকে পরিপূর্ণ কব্জায় আনতে। কালো মানুষের ঘর পুড়লো, দেশ ও সমাজ রসাতলে গেল। সেই পাশব অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে কালোদের মরণপণ সংগ্রাম আজো চলেছে। হয়েছে আরো তীব্রতর। ষোড়শ শতাব্দীতে এ্যাঙ্গোলার মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পর্তুগীজদের প্রধান আয়ুধ ছিল দাস ব্যবসা। লক্ষ লক্ষ এ্যাঙ্গোলা বাসীকে তারা কয়েদ করে চালান দিতো সুদূর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়। মোট ত্রিশ লক্ষের উপর এ্যাঙ্গোলাবাসীকে পর্তুগাল

এ ভাবে ঠেলে পাঠিয়েছিল ঐ দুই মহাদেশে। দিগন্তের সমস্ত আনন্দ তাদের জীবন থেকে মুছে যায়। এক অন্ধকার প্রহেলিকায় আদীম আফ্রিকার স্বাস্থ্যজ্জ্বোল তরুণরা অনিশ্চিতের পায়ে মাথা ঠুকতে থাকে বার বার। বাতাসে কোন সুবাস নেই, অজানা মহাদেশে তিল তিল শ্রম ব্যয়ে তারা গড়ে তুলতে থাকে সভ্যতাগর্বী শ্বেতাঙ্গদের নতুন বনিয়াদ।...

এ্যাঙ্গোলার যারা অধিবাসী, তাদের অধিকাংশই বান্টু উপজাতীর লোক। এ্যাঙ্গোলার মাটিতে পর্তুগীজরা প্রথমে সোনা বা হীরের খোঁজ করতে আসে নি। ওদের লুব্ধ দৃষ্টি এসে পড়েছিল, এ দেশের অধিবাসীদের উপর। সোনার চেয়ে এই সমস্ত সরল কাফ্রীরা অনেক বেশী মূল্যবান। বিশ্বের বাজারে দাস-ব্যবসায়ে ফুলে ফেপে একসার হয়ে উঠলো লিসবন সরকার।

সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ডাচেরা পর্তুগালের এমন ঢালাও লাভের ব্যবসা দেখে আর নিজেদের সংযত রাখতে পারে নি। তারাও গুটি গুটি এগিয়ে আসতে থাকে কঙ্গো ও এ্যাঙ্গোলার দিকে। কঙ্গোনদীর মুখে মস্ত এক ডাচ নৌ-ঘাঁটি গড়ে ওঠে। হামেশাই তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলি ঢুঁ মারতে থাকে পর্তুগীজদের উপর। এরই উত্তর দিতে পর্তুগীজরা গড়ে তুললো এ্যাঙ্গোলাতে আর একটি বন্দর ও নৌ ঘাটি,—বেঙ্গুয়েলা। পর্তুগালের জলদস্যু আর ব্রাজিলের সমাজ বিরোধীর দল সেখানে এসে ভিড় জমাতে থাকে। সেই চোয়ার লোকগুলোর অত্যাচারে উপজাতিরা ভয়ানক দিশেহারা হয়ে পড়ে। সাদারা কালোদের অস্তিত্বকেই স্বীকার করতে চাইছে না। জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ ও বিকাশ থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত তারা। সেই বঞ্চনা ভরা জীবনে প্রকৃতিও নিরানন্দ। মুক্তির পথ সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে পালিয়ে বেড়াতে চায় কাফ্রি সন্তান। কিন্তু শ্বেত চমূদের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে মুক্তিলাভ কোন আদীম সন্তানের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। জালিপথ খুঁজতে

খুঁজতে এ্যাঙ্গোলার যুবক পিপন্ন বিস্ময়ে দেখেছে, সে ঘুরে ফিরে পর্তুগীজদের খপ্পরেই এসে পড়েছে! সেই চরম মুহূর্তে, হয়রান হয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে অদম্য সাহসে বুক বেঁধে পায়ের তলার শুকনো ঝোপ ঝাড় ভেঙে মার মার রবে ছুটে আসতে থাকে সে দস্যুরা প্রস্তুত ছিল। ট্রিগারে আঙ্গুল নড়ে, শব্দ হয় বাতাস কাঁপিয়ে, আর ফিনকি দিয়ে বুকের রক্ত ছিটিয়ে অন্তিম চেতনায় শিহরিত নিগ্রো যুবক তখনো অবাক বিস্ময়ে দেখলো,—আকাশে সত্যি স্বর্ণ থালার মতো সূর্য এবং অসীম নীলাকাশে একদল সামুদ্রিক পাখি ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উড়ে যাচ্ছে কোন দিগন্তে!

পাহাড়ের উপর শহর, পাহাড়ের পায়ের কাছে নদী। দেশটা সবুজ আর মানুষগুলি কালো। পর্তুগীজরা এ দেশের ইজারা নিয়েছে ধূসর পাহাড়, রূপালী নদী আর সবুজ বনকে ঐ কালোদের রক্তে লাল করে তুলতে। নিজেদের অত্যাচারের স্বপক্ষে সাফাই গাইতে গিয়েও তারা যে যুক্তি দেখাচ্ছে, তাও সম্পূর্ণ অমানবিক। অরণ্যময় আফ্রিকা একমাত্র পশুশক্তির কাছেই নাকি শান্ত থাকতে পারে! সে মহাদেশের নাকি কৃষ্টি নেই, সভ্যতা নেই, ঐতিহ্য নেই! হাতে শানানো ছুরি নিয়ে য়ুরোপীয়রা এসেছে তাদের সুশিক্ষিত ক'রে তুলতে। সাথে আছেন ধর্মের ধ্বজা তুলে জেসুইট ও প্রাসুইট খৃষ্টসেবকরা!

পর্তুগীজ শাসক ক্যাডোরেঙ্গা [Cadorenga] তাঁর অত্যাচার-বিলাসে তো স্পষ্ট বলেই গেছেন :

They feared nothing save corporal punishment and the whip·· and it is only by force and fear that we can maintain our position over these indomita le heathen···

অবাধ্য হীদেনদের জন্য এটাই হলো লিসবনের একমাত্র দাওয়াই। পঞ্চদশ শতকের সেই দাওয়াই বিংশ শতকেও একমাত্র পর্তুগীজ নীতি। ক্যাডারেঙ্গার ভূত দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছে স্যালজারের কাঁধেও।

ইতিহাস বড় বিচিত্র! ইতিহাসের রক্তদাগ গুলি পড়লে মনে হয়, ঈশ্বর মারা গেছে বহুদিন আগেই। যার যে শাস্তি হওয়া দরকার ছিল, সে সেই শাস্তি পায় নি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তস্কর পুরস্কৃত হয়েছে এবং চৌর্যকর্ম ইতিহাসের বিকৃত ভাষ্যে জ্বল জ্বল করছে!

অন্তিম শয়নে শুয়েও তাই এ্যাঙ্গোলার বুকে লক্ষ লক্ষ বুলেট, বিষাক্ত গ্যাস···প্রয়োগ ক'রে চলেছেন স্যালজার। ইতিহাসটাকে ঠিকই নিজের মনমতো পথে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন তিনি।

এ্যাঙ্গোলাকে পর্তুগীজরা ছাড়বে না!

এ যেন তাদের কলিজা। দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরার সাথে অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। অবশ্য, এ্যাঙ্গোলা যে মাঝে মাঝে তার হাতছাড়া না হয়েছে, এমন নয়!

ডাচদের তো বরাবরই লোভছিল দাস ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান এ্যাঙ্গোলার উপর। ১৬৪১ সালে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছিল। ঘরে-বাইরে দারুণ বিপদাপন্ন লিসবন-সরকার। য়ুরোপের প্রতিটি জাতি বেনিয়া এবং দুর্বল পর্তুগালকে সবদিক থেকেই কোনঠাসা করে রাখতে চায়। ডাচরা ভয়ানক ঈর্ষা করে পর্তুগালকে। এ্যাঙ্গোলার মানুষকে গরু, ভেড়া, ছাগলের মতো হাটে বেচে পর্তুগালের দু'পয়সা হচ্ছে দেখে ওদের সর্ব অঙ্গে জ্বালা ধরে যায়। কঙ্গো নদীর অববাহিকা ধরে এ্যাঙ্গোলার প্রতি ধেয়ে আসতে থাকে ডাচ নৌবহর। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে পর্তুগীজদের বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়! এরা তো আর প্রকৃতির সন্তান সহজ সরল কাফ্রিরা নয়! এরা মূর্তিমান আর এক শয়তান! সেয়ানে সেয়ানে সেবার জমলো মন্দ নয়। কিন্তু লোক ঠেঙাতে পর্তুগীজদের যতই নাম ডাক থাক না কেন, আজ পর্যন্ত কোন য়ুরোপীয় শক্তির সাথে পাঞ্জা লড়াইয়ে সে পাত্তা পায় নি। পাত্তা পেলোনা এ্যাঙ্গোলাতেও। ডাচ আক্রমণের তীব্রতায় ব্যতিব্যস্ত পর্তুগীজরা পড়ি কি মরি ছুটে পালাতে থাকে,—লুয়াণ্ডা বন্দরে পত পত করে উড়তে থাকে ডাচদের চিত্রিত পতাকা।

লুয়াণ্ডার পতনে হাহাকার পড়ে গেল সুদূর লিসবনে। লুয়াণ্ডাই কাড়ি কাড়ি স্বর্ণমুদ্রা যোগাতো পর্তুগালের ভাণ্ডারে। এমন একটা বন্দর হাত ছাড়া হওয়াতে অর্থনৈতিক অভিশাপ লাগলো যেন পর্তুগালে।

আর খুশীর মত্ততায় উদ্বেল হয়ে উঠলো ডাচেরা। চরিত্রে পর্তুগীজদের সাথে তাদেরও তফাৎ উনিশ আর বিশ। তারা ও এ্যাঙ্গোলাবাসীর জীবনে কোন আশীর্বাদ বয়ে আনলো না। এক নরক থেকে আর এক নরকে স্থানান্তরিত হলো মাত্র লুয়াণ্ডা। লুয়াণ্ডার পাশেই বেঙ্গুয়েলা। এ্যাঙ্গোলার দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। পর্তুগাল শত্রু ডাচেরা এটাও দখল করবার জন্য পায়তাড়া কষতে থাকে। ১৬৪১ এর হিমেল সকালকে সাক্ষী রেখে ডাচ নৌবহর হানা দিলো বেঙ্গুয়ালাতেও। পর্তুগীজদের লড়বার ক্ষমতা সীমিত,—ওরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে মাত্র।

লিসবনের ঘোর দুর্দিন। এ্যাঙ্গোলার ডালাও দাস ব্যবসা তাদের হস্তচ্যুত! এর চেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আর কি হতে পারে!...পর্তুগীজ সৈন্যরা আরো ক'কদম সরে আসে ঘাঁটি গাড়লো এ্যাঙ্গোলার আর বন্দর ম্যাসাঙ্গানোতে। এখনকার অবস্থান ছাড়তে আর তারা রাজি নয়। মরিয়া হয়ে লড়াই চালালো ডাচ আর জাগা [Jaga] উপজাতির বিরুদ্ধে। ডাচরা আসে কামান-বন্দুক নিয়ে, আর জাগারা সুযোগ বুঝে অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ে পর্তুগীজদের উপর। তবু ম্যাসাঙ্গানো পর্তুগালের হাতছাড়া হয় নি। মাটি কামড়ে মরিয়া হয়ে লড়াই চালিয়ে সমস্ত আঘাত ফিরিয়ে দিয়েছিল সেদিন লিসবনের প্রতিনিধিরা। এ্যাঙ্গোলার বুকে পর্তুগীজ সৈন্যদের সেই সাহসিকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ঐতিহাসিক চার্লস্ বক্সার। তিনি লিখলেন :

"The men who held out so stubbornly at Massangano despite an almost unbroken series of crussing reserves —were inspired by something more than the expectations of securing slaves. The crusading spirit in its good and bad

aspects was still far from dead in Portugal, and war against the Moslem, the heathen, and the heretic was still regarded as a sacred duty. Despite the violence, greed and cruelty with which the history of Angola is stained, the fact remains that they sincerely believed that they were fighting God's battles and saving Negro souls from the fatal infection of heresy."

বিপন্ন পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে কাঁপা কাঁপা মোমবাতির মতো জ্বলতে থাকে ম্যাসাঙ্গানো। আদর্শের জাল বুনে তাকে রক্ষা করবার প্রাণান্ত প্রয়াস পাচ্ছে পর্তুগীজ সৈন্যরা। ওদের সেনাপতির বিরাট লম্বা নাক শুদ্ধ রুক্ষ ফোলা ফোলা মুখ আর জ্বলে জ্বলে চোখ দুটো আলো-আঁধারির আবছা খেলায় একান্তই হিংস্র। শিবিরের গায়ে ঝুলন্ত বন্দুক গুলি তুষার কণার মতো ঝক ঝক করছে। প্রতিটি কামানের মুখ বিদঘুটে জলহস্তীর মতো হা করে আছে।

সেই রণসজ্জা আর মরিয়া সেনাদের সমবেত করলেন এক অসাধারণ পর্তুগীজ সেনাপতি। ফ্রান্সিসকো দা সা কাউটিন হো। ডাচদের হটিয়ে দিলেন ফ্রান্সিসকো দা সা কাউন্টিন হো এবং অপর এক সেনাপতি স্যালভাডোর। যে সমস্ত আফ্রিকান নেতারা ডাচদের সাথে হাত মিলিয়েছিল, তাদের দুর্দিন আসে। বহু উপজাতি প্রধান নিহত হলেন পর্তুগাল সরকারের গুলির মুখে। সময় ১৬৫০। আবার এ্যাঙ্গোলার বন্দরগুলি থেকে হাজার ক্রীতদাসকে চালান দেওয়া হতে থাকে বুয়েনাস আয়ার্স এবং ব্রাজিলের বন্দরগুলিতে।

স্যালভাডোরের যৌবন দীপ্ত শাসনে এ্যাঙ্গোলা ক্রমশ তার যৌবনে এসে পা দিলো। সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের বান ডাকলো যেন! কে জানতো আদিম এ্যাঙ্গোলার আদুব দেহে এত সম্ভাবনা তিল তিল সঞ্চিত হয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক কোল থেকেই। পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে লিসবনী শোষণতন্ত্র পুরোপুরি কায়েম হয়ে বসে।

১৫৮০ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার দাস ব্যবসায়ের

সিংহভাগ ছিল এ্যাঙ্গোলার। আফ্রিকা থেকে মোট যত দাস চালান দেওয়া হয়েছিল, তার তিন চতুর্থাংশই সংগৃহীত হয়েছিল এ্যাঙ্গোলার মাটি থেকে। সেই হতভাগ্যদের জীবনপাত করতে হতো ব্রাজিলে, ক্যারাবিয়ানে, উত্তর আমেরিকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার দূর অগম্য প্রদেশেও।

তারপর য়ুরোপের ভাগ্যাকাশে একদিন মধ্যবেলার সূর্যের মতো দীপ্যমান হলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ছোট দ্বীপ কর্সিকায় তাঁর অসুলেখ্য জন্ম, তাঁরই প্রচণ্ড বাহুবলে সমস্ত য়ুরোপের সে কী থরহরি কম্পন!

বোনাপার্টকে যমের মতো ভয় করেন পর্তুগাল রাজও। তিনি ভালোই জানেন, নেপোলিয়নের অফুরাণ সামরিক শক্তির কাছে রাজধানী লিসবন তো এক টিপ নস্যি মাত্র, এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে। তাই বোনাপার্টের রশ্মির কাছ থেকে যত দূরে সরে থাকা যায়, ততই মঙ্গল। এমন চিন্তাতেই একদিন পর্তুগাল সাম্রাজ্যের রাজাধানী খোদ লিসবন থেকে সরে এসে নিরাপদে তার মহিমা বিস্তার করতে শুরু করেছিল সুদূর ব্রাজিল—রাজধানী রিও ডি জানিরো তে। সময় টা ছিল ১৮০৭।

আফ্রিকাতেও শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। পোড়ামুখ কালোরা থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অর্শকগীর মতো রক্তরক্ত লেগেই আছে। এরই ফাকে ১৮২২এ ব্রাজিল সূর্যের এক খণ্ড শ গ্রহের মতো ছিটকে বেরিয়ে আসে, দক্ষিণ আমেরিকাকে কাঁপিয়ে মহাতূর্য নিনাদে জানিয়ে দেয়, সে স্বাধীন, খোড়া লিসবনের খোড়া হবে সে আর রাজী নয়।

রিও ডি জানিরোর সংকেন উত্তেজনা এসে আছড়ে পড়লে এ্যাঙ্গোলার বুকেও,—ধিকি ধিকি আগুন জ্বলতে থাকে লুয়াণ্ডা আর বেঙ্গুয়েলাতে। সবচেয়ে বেশী বিক্ষোভ দাস ব্যবসার বিরুদ্ধে। কালো মানুষদের আর অমন ধরে ধরে গরু- ভেড়ার

মতো হাটে বেসাতি করা চলবে না! উনবিংশ শতকের প্রগতির মুখে পর্তুগীজদের এই জঘন্য ব্যবসা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম ঘৃণ্য নয়।

এ্যাঙ্গোলার পর্তুগীজ গভর্ণর সাদা বান্দিরা তাই একদিন এই গ্লানির হাত থেকে মুক্তি চাইলেন। ১৮৩৬ এ এ এক ফতোয়া জারি করলেন তিনি। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বললেন, ঐ বৎসরেরই ডিসেম্বর মাস থেকে দাসপ্রথা থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি দেয়া হবে এ্যাঙ্গোলাকে!

এমন ঘোষণায় দারুণ শিহরণ উঠলো এ্যাঙ্গোলায়।

নির্যাতীতরা মুগ্ধ বিস্ময়ে স্বাগত জানালো। দাস-ব্যবসায়ীর দল রেগে ভেলে আগুন। বেনিয়াদের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। মানুষের শ্রম নিয়ে অপ্রত্যক্ষ দাস-ব্যবসা এখনো চলেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ দাস ব্যবসায়ের স্বাদের সাথে তার তুলনাই হয় না। মর্মর মসৃণ মধ্যযুগীয় সুখ-বিলাস, ব্যাভিচার, বীরধর্মের চরিতার্থে বুক কাঁপানো অত্যাচার, আবার পিরামিড, তাজমহল ইত্যাদি শোভিত মানবিক সভ্যতার নয়ন তৃপ্তিদায়ক সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে দাস ব্যবসা যেন সেইক্ষণে মানুষের ইতিহাসের স্বপক্ষে জয় ঢাক পিটিয়ে চলেছে। আমেরিকার অবিশ্বাস্য কালরাত্রিকে চিরে এক সূর্য সমর্পিতা অফুরাণ সম্ভাবনা সমৃদ্ধিকে আনবার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ক্রীতদাসদের, — হাজার হাজার, লাখ লাখ সবল দেহী সরল মন বনজ কাফ্রীদের।

এ্যাঙ্গোলা যোগাতো সেই বনশ্বর মানুষদের। গুরু গুরু চামড়ার বাজনা বাজিয়ে ওরা যখন নাচে, পর্ণকুটীর গুলির মাথায় মাথায় যখন অজস্র থোকা থোকা আঙ্গুর আর কদলী দোল খায়, যখন আদিম মানবী তার কৃষ্ণ প্রস্তর আদুড় দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ ইভ, ঠিক সেই সময় লিসবনের বেনিয়ারা ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে টপা টপ আপেল ছিঁড়ে নেবার মতো মানুষগুলিকে তুলে নেয় জাহাজে; তারপর সেই রাতের অন্ধকারেই ভেপু দিতে দিতে হিল্লোলিত ক্রীতদাস জাহাজগুলি ছুটতে শুরু করে রিও ডি জেনিরোর উদ্দেশ্যে।...

এমন অত্যাচার আর সেই অত্যাচারের স্বর্ণমানদণ্ড এক লহমায় দুমড়ে মুচড়ে গেল প্রবল প্রতাপ পর্তুগীজ কর্তা সাদা বান্দিরার রাজ-হুকুমে : এ খেল খতম। সভ্যতা এগিয়েছে ! দাস ব্যবসায়ের যুগ আর নেই। তোমরা এখন অন্যভাবে মানুষের রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জাকে কাজে লাগাবার ধান্ধা খোঁজ, এমন প্রত্যক্ষ মানুষ চালান আর চলবে না।

কিন্তু চলবে না বললেই হলো ?

দাস ব্যবসা যারা এতদিন করে এসেছে, তাদের শক্তি কি গভর্ণ-মেণ্টের চাইতে কম ? বরং ওরাই তো কিং মেকার। যুগ যুগ ধরে গোল্ডেন আর সিলভার টনিক খেয়ে ধমনী, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহে যে তেজ, তা পৃথিবীর যে কোন রাজ-শক্তিকে উপেক্ষা করবার স্পর্ধা রাখে।

স্বার্থে ঘা পড়লে এমন লোকেরা মুহূর্তে এক হয়ে যেতে পারে।

এ্যাঙ্গোলাতেও তাই হলো। সামন্ততন্ত্র আর বণিকতন্ত্র তখন হাতে হাত মিলিয়েছে। কুমরী মহাদেশের জঠরে তারা আগুন ধরিয়ে দেয় ; এতদিন রাজশক্তির সস্নেহ প্রশ্রয়ে যারা ক্রমশই নিজেদের স্ফীত করে তুলছিল, সেই মুহূর্তে তারাই অস্ত্র শানালো শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

লিসবনের সাধ্যে কুলাতো না সেই স্ফীত উদর মানুষগুলিকে দমন করে, কিন্তু তা সম্ভব করলো অন্যএক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটিশ। জাতি হিসাবে ইংরেজদের সাথে পর্তুগীজদের কোন তুলনাই হয় না ; একদল সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সাথে সাথে সভ্যতারও ক্রমোন্নতি ঘটিয়েছে, অন্যদল শুধুই বন্দুকের নলে ধ্বংস করে এসেছে !

তাই দাস ব্যবসায়ের স্বপক্ষে স্বার্থান্বেষী পর্তুগীজ বেনিয়ারা যখন অস্ত্র ধরলো এবং সেই অস্ত্রের চাকচিক্যে খোদ লিসবন যখন দিশেহারা তখন দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশ নৌবহর এসে সজোরে হানা দিলো এ্যাঙ্গোলার বন্দরে বন্দরে, তচনছ করে দিল পর্তুগীজ দাস ব্যবসায়ীদের সমর্থ

জোটকে। ১৮৪২ এর স্মরণীয় আক্রমণে যুগ যুগান্তের দাস ব্যবসা শেষ বারের মতো মুখ থুবড়ে পড়লো আফ্রিকার মাটিতে।

দাস ব্যবসা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়নি এ্যাঙ্গোলা। এখনো এর সূর্যের মুখ লাল। লজ্জায় লাল, মুক্তিকামীদের রক্তে লাল। প্রাচীন ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদ আজো অজগরের মতো উদরে স্থান দিয়ে আছে তাকে। ভিতরের দাবানল তাকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে প্রাণপন, কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজন বাহ্যিক আক্রমণের। তারই ক্ষেত্র প্রস্তুতে সংগ্রামী আফ্রিকা এক ঐক্যসূত্রের সন্ধান করে ফিরছে বিংশ শতাব্দী প্রথমক্ষণ থেকেই। জানিনা, সেই পরিবেশ কবে বাস্তবায়ির হবে।

আমার অফুরাণ প্রীতি নিও

ইতি

সোলেমান

[সোলেমান ভাইয়ার এই চিঠির কোন উত্তর দেওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ ব্যাঙ্গালোরে ফিরেই ভয়াবহ এশিয়াটিক ফ্লুতে আক্রান্ত আমি প্রায় একপক্ষ কাল শয্যাশায়ী ছিলাম।···কিছুটা সুস্থ হ'য়ে উঠবার পরই প্রায় অপ্রত্যাশীত ভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এক শুভেচ্ছা মিশনের কনিষ্ঠতম সদস্য হয়ে চলে গেলাম জাপানে।···নিজের অনবহিত মনের জন্যই আর সোলেমানকে কোন চিঠি দিতে পারি নি। আবার ভারতে ফিরে এসে দেখতে পেলাম, ইতিমধ্যে সোলেমানের আর এক খানা দীর্ঘ চিঠি এসে জমা পড়েছে আমার ড্রয়ারে। সেটাই সোলেমানের শেষ চিঠি। দুর্ভাগ্য! আমাদের যোগসূত্রটি বেশ কিছুদিন হয় হারিয়ে গেছে। সোলেমান লিমা ছেড়ে কোথায় আছে, জানিনা!]

প্রিয় সেনগুপ্ত,

এমন নীরবতা কেন? নীলাভ সমুদ্রের বুকে বিচরণ করতে করতে তোমায় যে চিঠি দিয়েছিলাম, তা কি তুমি পাও নি? না পেলে আমার দুর্ভাগ্য।

কুটনীতির জগতে কোন কূট কৌশল দেখাতে না পারলেও আমার পদোন্নতি হয়েছে ! আমার কাজই হলো ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় কায়রোর জরুরী বার্তা নিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো।

অর্থাৎ আমি এখন কখনো ছত্রী সেনা, আবার কখনো বা সি-ম্যান। কখনো দেখছি, ধোঁয়াটে আকাশ চিরে বিপুল বেগে ধেয়ে চলেছি, আবার কখনো, সীমাহীন জলধির মাতলামি, যার বুকে আমাদের ভাসমান জাহাজটি যেন এক নীলোৎপল !

হাঁ, আমি এখন লিমাতে। পেরুর রাজধানী লিমা। সেই স্বপ্নে গড়া দেশ, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বহুশতাব্দী যে দেশ ছিল অপার রহস্য ও অনুসন্ধিৎসার বস্তু, অথচ যার সমুন্নত সভ্যতা সত্য রেনেশাঁস সমৃদ্ধ য়ুরোপীয় সভ্যতার চাইতে কোন অংশে হীন ছিল না। আগাগোড়া সোনা-রূপা, মনি-মুক্তা দিয়ে সজ্জিত সেই দেশ গ্রাসে একদিন স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লস তাঁর লোভাতুর নখর হাত বিস্তার করেছিলেন তাঁরই সম্রাজ্ঞীর অকৃপণ অনুদানে সমৃদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ নাবিক পিজারো মাত্র একশ' চৌষট্টি জন সৈসেনা সহ একদিন মার মার রবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পেরুর বিশাল উপকূল ভাগে, রক্তের বান ডেকেছিল, সাদা মানুষদের রক্ত পিপাসু চরিত্র দেখে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন ইংকা সম্রাট আতাহুয়ালপা।

প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত প্রসারতার ছবি দেখতে দেখতে পেরুর মাটিতে পা দিয়ে মন আমার হারিয়ে যাচ্ছিলো অতীতে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে এ দেশের বুঝি তুলনা হয় না,—এখানে যেমন রয়েছে ধূধূ মরুভূমি, তেমনি রয়েছে সবুজে সবুজ উপত্যকা, এখানে যেমন রয়েছে নগাধিরাজ আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-পর্বত, তেমনি রয়েছে সংখ্যাতীত শিরা-উপশিরার মতো নদী জপমালা।

আণ্ডিজের বুকে সামুদ্রিক বাতাস ঝাপটা মারে, সেই বাতাসই গোঙাতে গোঙাতে উড়ে যায় মনটানা অর্থাৎ গহণ বনানীর উপর দিয়ে। আণ্ডিজ মহিমায় ও প্রসারতায় তোমাদের শ্রেষ্ঠ পর্বত

হিমালয়ের সাথে তুলনীয়,—অসংখ্য শাখা পর্বতের হাত ধরে সে এগিয়ে গেছে। এর মধ্যে ইয়াসকারান চূড়োটি তো প্রায় আকাশ ছোঁয়া—বাইশ হাজার ফিট তার উচ্চতা।

সমুদ্রের গাঁ ঘেসে দাঁড়িয়ে থাকলেও পেরুর উচ্চতা অনেক। সমুদ্র লেভেল থেকে কোন স্থানই বারো হাজার ফুটের নীচে নয়। পেরুর পাহাড়ী অঞ্চলেই রয়েছে পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি হ্রদ টিটিকাকা,—বারো হাজার ফুট উচ্চে সেই আয়না চকচকে জলাশয় এক দেখবার বস্তু!

চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতেও পেরু ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির অন্যতম। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম,—এ রাজ্যের যেন কোন সীমা খুঁজে পাওয়া যেত না। ইকোয়েডর, বলিভিয়া, চিলি —সমস্তই ছিল পেরুর অধিকারে।

এ দেশের অধিপতিকে বলা হতো ইংকা। জাপ সম্রাটের মতো ইংকাও নিজকে মনে করতেন, সূর্যসন্তান! সাধারণ মানুষও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতো, দেবপুত্র বলে। পেরু লোকেরা গড়ে তুলেছিল এক আশ্চর্য গৌরবান্বিত সভ্যতা, যদিও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধাতু লোহার ব্যবহার তারা জানতো না। তাদের স্থাপত্য ইতিহাসের বিস্ময়,—পাথরের পর পাথর বসিয়ে তারা যে সমস্ত দুর্গ ও প্রাসাদ তৈরী করে গেছে, কারিগরী বিজ্ঞানে সেগুলির মর্যদা অসাধারণ। দেশে উন্নত সেচ ব্যবস্থা চালু ছিল,—পর্যাপ্ত খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল এই দেশ, কোনদিন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এসে পড়েনি তার বুকে। পেরু থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আলু চাষ শিখেছিল।

ইংকাদের রাজত্বকালেই পেরু তার উন্নতির চরম শীর্ষে পৌঁছে যায়।

এই ইংকাদের প্রাধান্য শুরু হয়েছিল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। তবে তাদের আসবার আগেও পেরু মোটেই বর্বর ছিল না। প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এই দেশটি সভ্যতায়—সমৃদ্ধিতে দক্ষিণ

আমেরিকায় অনন্ত হয়ে আছে। অবশ্য ইংকারাই যে এমন অপূর্ব সভ্যতার স্রষ্টা, তা নয়। ইংকাদের আগমনের অনেক আগেই পেরু তার সভ্যতার রথ চালিয়ে এসেছে বহুদূর। সে সভ্যতার স্রষ্টা কারা? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

আমি টিটিকাকা হ্রদে ছোট্ট একটি বোট নিয়ে এক সন্ধ্যায় ঘুরে এলাম। নিস্তরঙ্গ জল, মাথার উপর ধোঁয়াটে আকাশ, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। এই হ্রদেরই চারপাশে এমন সমস্ত ধ্বংসস্তূপ রয়েছে, যা ইংকাদের অনেক আগেই নির্মিত হয়েছিল। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্রত্নতত্ত্ববিদ থর হেডেরডাল প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সেই আদি সভ্যতার স্রষ্টারা 'বালসা'য়* চেপে একদিন পেরু এবং সুদূর পলিনেশিশার দ্বীপগুলিতে তাদের সভ্যতা প্রচার করেছিল। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েই থর হেডেরডাল একদিন এমন একটি পাল তোলা ভেলা 'বালসা'য় চেপে অসীম প্রশান্ত মহাসাগরকে পাড়ি দিয়েছিলেন। ঘটনাটা বেশীদিন আগের নয়। গোটা পৃথিবী সেই দুঃসাহসিক অভিযানে একেবারে থ' বনে গিয়েছিল!

ইংকাদের ধারাবাহিক ইতিহাস জানবার উপায় আমাদের নেই। কারণ, পেরুর লোকেরা তখনো লিখে যাবার মতো হরফ আবিষ্কার করতে পারে নি। যেটুকু জানতে পারা গেছে, তা সবই লোকপরম্পরায় প্রচলিত। প্রথম যিনি ইংকা শাসিত পেরু সম্পর্কে কিছু লিখিতভাবে রেখে গেছেন, তিনি হলেন গার্সিলাস্‌সো দে ভগা। লিমার জাতীয় গ্রন্থাগারে দে ভেগার ইংরাজি তর্জমা আমি পাঠ করেছি। মন হারিয়ে গেছে অতীতে। লেখক গার্সিলাসের শরীরে ইংকাদের রক্ত প্রবাহিত,— তাঁর মা ছিলেন ইংকা রাজপরিবারেরই মেয়ে। গার্সিলাস্‌সো দে ভেগার রচনার ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয় অসাধারণ, কিন্তু এটিকে নির্খাদ ইতিহাস বলতে পারি না কখনো। বরং, মনে হয়েছে, বইটি নেহাৎই

* প্রাচীন পেরুতে ব্যবহৃত একপ্রকার ভেলা,—একটি মাত্র কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী হতো এই সমুদ্র বিচরণকারী প্রকাণ্ড ভেলাগুলি।

কল্পকথায় ঠাসা। তিনি লিখেছেন সূর্যদেবের দুইটি সন্তান,—একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম ওয়েলা হুয়াকো এবং মেয়েটির নাম মানকো কাপাক। এই দুইজনের শিক্ষাতেই পেরু প্রথম সভ্য হয়ে ওঠে।

পেরুর একজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ বেরুন তোরার সাথে আমি এই দেশের দুরারোহ গিরিবর্ত্ম মার্কাহাউসি প্লেটোতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এই গিরিবর্ত্মে পাথর কেটে কেটে যে পথ নির্মিত হয়েছে, তা ইংকাদের আগমনের অনেক পূর্বেকার। সেই আদিম সভ্য মানুষরা এমন সুউচ্চ প্লেটোতে পর পর বারোটি কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করেছিল সেচের জল সরবরাহ করবার জন্য।

পাহাড়ের গায়ে দেখতে পেলাম কতকগুলো অদ্ভুত ছবি আঁকা। হাতী, উট, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি। আর রয়েছে এক কাফ্রীর মস্ত মুখ আঁকা। আশ্চর্য! ইংকাদের রাজত্বকালে তো ঘোড়ার ব্যবহার পেরুতে চালু ছিলনা, আর কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সময় কোন কাফ্রীর আগমন ঘটেনি বলেই তো আমরা জানতাম!

প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু বেরুন তোরা বললেন, "পেরুর সভ্যতার গভীরতম প্রদেশে আজো আমরা পৌঁছতে পারিনি। যেদিন পারবো, সেদিন সমস্ত বিশ্ব চমকে উঠবে,—য়ুরোপের অনেক আগেই হয়তো এই পেরু এশিয়া ও আফ্রিকার সাথে হাত মিলিয়েছিল।"

অতীত পেরুর এই সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন দেখতে দেখতে মন আমার ঘুরপাক খাচ্ছিলো নিজের সভ্যতাশ্রেষ্ঠ জন্মভূমির প্রান্তরে প্রান্তরে, সেই অসাধারণ আবুসিম্বেলের উপর,—দ্বিতীয় রামসিসের যা এক অসাধারণ কীর্তি। অনেক দিন আগে, প্রায় বছর দশক আগে আবু-সিম্বেলের পাথুরে বুকে তেজী ঘোড়ার মত আমি পাক খাচ্ছিলাম বার বার,—আমার বাঁয়ে রামসিসের বিশাল মন্দিরে আঁচড় কেটেছি, ডাইনে নেফেরতারির ঘ্রাণ নিয়েছি এবং সবশেষে সামনে নীলে নীল নীল নদে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটেছি। এই নদ এঁকে বেঁকে

চলে গেছে, মিশে গেছে বিরাট এক হ্রদে, আমাদের সবার প্রিয় নেতার নামানুকরণে যার নাম রাখা হয়েছে নাসের হ্রদ। টিটিকাকা হ্রদ দেখে আমার মনে স্বাভাবতই নাসের হ্রদ ছবি ফেলেছিল। জন্মভূমির দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছি।

সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে সম্ভাবনায় আমার মরুদেশ আমার ধ্যান, আমার স্বপ্ন! মনে আছে, সেই প্রথম তারুণ্যে লুক্সার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার পথে বার বার শুকনো পাহাড়ী বাতাসের ঝাপটা খেয়েছিলাম। আমার পাশে পাশে হাঁটছিল এক সুদর্শনা মহিলা এবং তাঁর বিশালদেহী স্বামী। লুক্সা থেকে আবুসিম্বেল যাওয়া যে কী শ্রমসাধ্য, তা বর্ণনা করা যায় না। হাইড্রোফয়েলে যখন আমরা পৌঁছলাম, তখন আমার সহযাত্রী দম্পতি বড় ক্লান্ত, বিশেষতঃ সুন্দরী মহিলা কেমন যেন করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন আমার মুখের দিকে।

আমি সে সময় বড় লাজুক ছিলাম, দৃষ্টির মদিরতায় দেহের ভিতরটা শির শির করে উঠছিল। ইচ্ছে হচ্ছিলো, তাঁকে পথ-চলতে সাহায্য করি। কিন্তু তাঁর স্বামীর রুক্ষ গাম্ভীর্যে তা আর সম্ভব হয়নি। একই হাইড্রোফয়েলে আমরা সাঁ সাঁ এগিয়ে চলেছি। আমরা তিন জন,—কিন্তু আমি বড় বিচ্ছিন্ন, একা!

এই যে একাকীত্ব এরই জ্বালা থেকে আমি কোনদিন মুক্তি পাচ্ছি না। যুদ্ধক্ষেত্রে, অসীম নীলাভ সমুদ্রে, লক্ষ লক্ষ নর-নারী অধ্যুসিত মধ্যনগরে, ক্লাবে-রেঁস্তোরায়, পার্কে, ডিপ্লোম্যাটিক ডিসকাসনে-আমি একা।

যাকে ভালো লাগে, তাকে আমার হৃদয়ের আকুলতা জানাতে বাধা পাই। আমার পদমর্যাদা আমাকে উচ্ছ্বাস জানাতে বাধা দেয়। তীব্র জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়ে লড়াই চালাতে গিয়ে দেখি, আমার উপরওয়ালাদের কত মারাত্মক ভুলে আমরা যেন এক মরিচিকার মধ্যেই ছুটে চলেছি।

রামাসিসের বিশাল মূর্তিকে যেমন খণ্ড খণ্ড করে অন্য এক স্থানে

বসানো হয়েছে, আমারও সত্তাকে কেউ যদি তেমন খণ্ড খণ্ড করে আবার এক জায়গায় সুস্থির ভাবে এনে বাসয়ে যেতো! নীলনদের পাড়ে রামাসেসের মূর্তী যেখানে পুর্ণপ্রতিষ্ঠিত, তারই গা ঘেঁসে যাওয়া একটি ফুলও ফল শোভিত রাস্তার নাম হানিমুন রোড। এটা এক আনন্দের নন্দন কানন,—দেশ বিদেশের নর-নারী তাদের যৌবন উচ্ছ্বলতা নিয়ে প্রায় আছড়ে পড়ে এর বুকে, পার্কের ঝোঁপ-ঝাঁপের ছাদনা তলায় দুটি দেহ সমান্তরাল হয়ে আসে, সঘন আবেশ ধ্বনিতে সৃষ্টি হয় আগামী বংশধরদের দল!

আর আমি?

আমি তখন নেফেরতারির প্রতিমূর্তিটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সমানে এ্যালকহল গিলে চলেছি। কোথায় আমার আফ্রোদিতি! সে কে? জবাব নেই?

সেনগুপ্ত, সে কে?

সে কী সেই জাহাজের ইহুদী বন্দিনী, যার সূত্র তুলে তুমি আমায় প্রথম চিঠি লিখেছিলে? সেই অত্যাচারিতা?

উঃ! ভাবা যায় না!

ইতি

তোমার

সোলেমান ভাইয়া।